ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পটে ত্রিপুরা

(১ম খন্ড)

।। রমাপ্রসাদ দত্ত ।।

মানবী প্রকাশণী
এস. কে. বি লেন
আগরতলা

OITSYAO ETIHASESAR POTEY TRIPURA
(EASSYES)
BY
Rama Prasad Datta

ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পটে ত্রিপুরা

(প্রবন্ধ সংগ্রহ)

রমা প্রসাদ দত্ত

প্রকাশক : কল্যাণী ভট্টাচার্য
মানবী প্রকাশনী, ধলেশ্বর, আগরতলা।

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : ডঃ মণিকানন্দী

অক্ষর বিন্যাস : স্পীড প্রিন্ট, অফিসলেন, আগরতলা।

প্রাপ্তি স্থান -- এডুকেশন বুক সোসাইটি
লেনিন সরণী আগরতলা - ১
মধুমিতা প্রকাশণী
কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর ঃ -
মৌসুমী রায়

মূল্য ১০০ টাকা

উৎসর্গ

পিতা ঁ বিপ্রচরণ দত্ত
মাতা ঁ সরোজিনী দত্ত
এর পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে ।

লেখকের কথা

ছয় এবং সাতের দশকে বিক্ষিপ্তভাবে ত্রিপুরার ও বহিরাজ্যের সাময়িক পত্র দৈনিক পত্রিকাতে ত্রিপুরা কেন্দ্রিক সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং আর্থ- সামাজিক বিষয়ে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরায় সামগ্রিক আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে এরাজ্যে কোন প্রকাশন শিল্পের জন্ম হয়নি তখন। তাই পুস্তক আকারে কোন প্রবন্ধ সঙ্কলনের সুযোগ হয়নি। এখন কিছু দুঃসাহসী ব্যাক্তিত্বের চেষ্টায় ত্রিপুরার প্রকাশনা শিল্পের কিছুটা প্রসারণ ঘটেছে --আর তার ফল এই বাস্তবতা।

কিন্তু মূল বাস্তবতার একটা অন্য বিস্ময়কর দিক আছে। নইলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক এহং বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আগরতলায় এসে আমার নগণ্য সংগ্রহশালায় পদধূলি কেন দেবেন ? কেন এই লব্ধখ্যাত গবেষক অধ্যাপক অপার স্নেহে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছড়িয়ে থাকা আমার প্রবন্ধগুলির কোন দোষ না দেখা প্রশ্রয়ের চোখে পড়বে ? আর কেনই বা সেগুলি থেকে কয়েকটিকে স্ব-প্রণোদিত ভাবে নির্বাচিত করে সেগুলিকে নিয়ে একটি বই প্রকাশ করার অলঙ্ঘ্যনীয় পরামর্শ আমাকে দেবেন।

বর্তমান বইটির প্রকাশের এক এবং অনন্য উৎসাহ অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ই। তিনিই বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন এমন কি বইটির নামাকরণও তিনিই করে দিয়েছেন। এই বই আমার যতটা প্রকৃত অর্থের তার চেয়ে অনেক বেশী অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানো আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। আমি তাঁকে শুধু শ্রদ্ধাই জানাতে পারি।

'মানবী' প্রকাশনীর প্রকাশিকা ভগ্নীতুল্যা শ্রীমতি কল্যাণী ভট্টাচার্য এই বই প্রকাশের সমস্ত দায় ও ব্যয় ভার স্ব-স্বন্ধে বহন করে আমাক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে নিয়েছেন।

এই বই আগেই বলেছি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন। সেই পত্রিকার অনেক গুলিই আজ হারিয়ে গেছে। তবু আমার প্রথম কৃতজ্ঞতা সেই সব পত্রিকার পরিচালক গোষ্ঠীর কাছে জানাই। যে সাময়িক ঢেউ তাঁরা তুলেছিলেন তার পিঠে চেপেই আমর সমুদ্র যাত্রা। তারা আমার প্রিয়ভাজনতো ছিলেনই। আজ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পেয়েছি প্রেরণা ও সহযোগিতা শিল্পী শক্তি হালদার, শ্রী রামলাল দত্ত এবং অধ্যাপক মিহির দেব মহোদয়দের নিকট হতে। তাদেরকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

যদি এই বইয়ের প্রবন্ধ বর্তমান কালের পাঠকদের কারো ভালো লাগে বা কাজে লাগে তাহলে কৃতার্থ বোধ করবো।

রমাপ্রসাদ দত্ত

১৩ - ১ - ২০০০ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

দেশ কাল ও পাত্রের সমবায়ী সত্তার নাম ইতিহাস । যে ইতিহাসের কিছু অংশ বাস্তব প্রকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিছু প্রবাদ প্রবচন বিধৃত, কিছুটা - বা সম্পূর্ণরূপে কল্পনানির্ভর একালে যাঁরা ইতিহাস দর্শনে আসক্ত, তাঁরা কমবেশ যে শুধু 'পাথুর‍্যা' প্রমাণই ইতিহাস নয় অনেক সময়ে প্রবাদ, লোককথা, জনশ্রুতিও ইতিহাসের উপাদান বলে গৃহীত হতে পারে । " ইতি হ আস" অর্থাৎ এইরূপেই ছিল । কিন্তু এটা কি ইতিহাস ? কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস ' রাজতরঙ্গিনীতে বলা হয়েছে "ভূতার্থ কথনই" যথার্থ ইতিহাস। অর্থাৎ অতীতের ঘটনা বিবৃতি নয় তার অর্থ কথন,ব্যাখ্যাবিশ্লেষণই যথার্থ ইতিহাসের মানদন্ড। সম্প্রতি কয়েকদিন আগরতলায় অবস্থানকালে এই কথাটি উপলব্ধি করলাম শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত প্রত্ন উপাদান থেকে। শ্রীযুক্ত দত্ত প্রায় একক চেষ্টায় ত্রিপুরার ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য-- সংস্কৃতির বিবিধ শাখাপ্রশাখা আবিষ্কার ও অনুসন্ধান করে এই অঞ্চলের একটি তথ্যনিষ্ঠ অথচ সুখপাঠ্য পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন।তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ স্থানীয় নানা পত্র - পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বাইরের পত্রিকাতেও মুদ্রিত হয়েছে । তাঁর নিজস্ব প্রত্নশালাটিও বিপুল পরিশ্রমের বিচিত্র নিদর্শন। এইটি ঘুরে দেখে আমার ধারণা হয়েছে , বাঙালি একা একা অসাধ্য সাধন করতে পারে । কিন্তু দল বাঁধলেই দলাদলি ফলে কাজটা পন্ড হয় ।একজন নগেন্দ্র নাথ বসু 'বিশ্বকোষ' প্রকাশ করেছিলেন । একজন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষার বিশাল অভিধান রচনা করেছেন, একজন দীনেশচন্দ্র সেন, একজন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য ও ভাষাকে অজ্ঞাত কোণ থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে টেনে এনেছেন। য়ুরোপে কিন্তু যে -কোন বৃহৎ সারস্বত কাজের পিছনে থাকে বহুজনের মিলিত চেষ্টা । প্রাচীন স্কচ, কেল্টিক ও গ্রেট ব্রিটেনের লোকভাষা নিয়ে সহস্রজনে চেষ্টা করে ইউরোপীয় ভাষার বিশাল কলেবর নিমার্ণ করেছেন । পরিতাপের বিষয় এদেশে এমন কাজের বড়ো বেশী দৃষ্টান্ত নেই ।সেই জন্য কোনো গবেষণা কর্মের জন্য একক চেষ্টার উপর বেশী নির্ভর করতে হয় এবং সেই জন্য রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের মতো পরিশ্রমী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু গবেষকের একক সাধনার উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় ।

ইতিপূর্বে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়, এদেশীয় ও বিদেশী লেখকের ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ।এ দেশের প্রত্ন - ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ ত্রিপুরা একটি বিচিত্র অঞ্চল ।এর পাহাড়, অরণ্য, রুক্ষ ,মাটি , শষ্যশ্যাম কৃষিক্ষেত্র এর মঠ মন্দির ও নানা স্মৃতিসৌধ , মহারাজাদের নানা কীর্তিকলাপ এই শান্তস্নিগ্ধ পর্বতবন্ধুর উপত্যকায় অপূর্ব নকশী কাঁথা সৃষ্টি করেছে । আছে আর্য প্রভাব, বৌদ্ধ ও জৈন সংস্পর্শ, পাহাড়িরা আদিবাসীদের বিত্রিত্র জীবনযাত্রা ও গ্রামীণ সংস্কৃতির নানা বৈচিত্র্য । এখানে কত তীর্থ, কত সাধনার ক্ষেত্র ।ভাষা উপভাষা নিয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির

যে বিশাল সৌধ গড়ে উঠেছে তা শুধু বাংলা নয় ভারতেরই সম্পদ বলে পরিগণিত হতে পারে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দত্ত নিজস্ব চেষ্টা ও নিষ্ঠার বলে ত্রিপুরার সমগ্র চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কি ভাবী প্রজন্মের অগোচরেই রয়ে যাবে? তাই এগুলির আশু সংকলন কর্তব্য। শ্রীযুক্ত দত্ত সরস্বতীর প্রসাদ পেলেও বোধহয় রমাসুন্দরীর ততটা স্নেহধন্য হতে পারেননি। এর জন্য প্রয়োজন সরকারী অনুদান এবং সংস্কৃতিকামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ সহায়তা।

তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ থেকে নির্বাচিত করে গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংকলনটির একটি নাম নির্দেশ করা উচিত। আমার মনে হয় এই সংলনটির নামটি কতকটা এই রকম হলে লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট হবে - 'ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পটে ত্রিপুরা'। এই প্রবন্ধগুলিতে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক ত্রিপুরার ইতিহাস,ভাষা - সাহিত্য, শিল্পকলা, জনজীবনের যে বিচিত্র পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে, কোনো ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়রের একাধিক খন্ডেও তা পাওয়া যাবে না উদাহরণ স্বরূপ কয়েকেটি নিবন্ধের উল্লেখ করি। ত্রিপুরার মুদ্রার ইতিহাস, , ত্রি পুরার বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও নাথধর্মের স্বরূপ, ককবরক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় -- এগুলিতে যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়, তা একজনের চেষ্টায় সমাধা হওয়া সম্ভব নয়। আসল কথা পরিশ্রমের সঙ্গে নিষ্ঠা ও অনুরাগ না থাকলে সমস্ত আলোচনা ও গবেষণা নীরস হয়ে পড়ে। সে জাতীয় রচনায় জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। কিন্তু আনন্দ ও বিস্ময়ের আকর্ষণ থাকেনা বলে সেই সমস্ত গ্রন্থ গ্রন্থাগারের ধূলিধূসর কোণে কোনোপ্রকারে আত্মরক্ষা করে, তার পর কীটের ভোজ্যে পবিণত হয়। কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবুর এই সংকলনটি একই সঙ্গে তত্ত্ব - তথ্য ও আনন্দের খনি। কৌতূহল এর অন্যতম ফলশ্রুতি। পাঠক - পাঠিকা কৌতূহলী হয়ে এই প্রবন্ধগুলি থেকে তাঁদের দেশকে আরো গভীরভাবে জানুন, এইটি আমার একান্ত বাসনা।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়কে সমবঙ্গভাষাভাষী সমাজের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁর এই নিষ্কাম, নিরলস ও অতন্দ্র নিষ্ঠা পরবর্তী পথিকদের উৎসাহিত করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের
প্রাক্তন অধ্যক্ষ
এবং
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক
আগরতলা ২৬ - ৪ - ৯২

ত্রিবেগ নগরীং শুভাম্

ভারতের মানচিত্রে প্রাচীন ত্রিবেগ রাজ্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না । প্রাচীনকালের ত্রিবেগ বর্ত্তমান যুগে কী নাম ধারণ করেছে সে নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে এখনও মতভেদ আছে। সে যুগে ত্রিবেগের সীমানা ছিল পূর্বে মেখলি, পশ্চিমে কোচবং, উত্তরে তৈরঙ্গ নদী এবং দক্ষিণে আচরঙ্গ। সংস্কৃত রাজমালায় আছে "যস্য রাজ্যস্য পূর্ব্বস্যাং মেখলিঃ সীমতাং গতঃ। পশ্চিম স্যাং কোচবঙ্গোদেশঃ সীমতি সুন্দরঃ । উত্তরে তৈরঙ্গ নদী সীমতাং যস্য সঙ্গতা । আচরঙ্গ নাম রাজ্যে যস্য দক্ষিণ সীমিত । এতন্মধ্যে ত্রিবেগাখ্যাং দ্রুহ্যু সুশাসিতং ।" প্রাচীন রাজমালা বলে, ' ত্রিবেগ স্থলেতে রাজা নগর করিল । কপিল নদীর তীরে রাজ্যপাট কৈল । উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ। পূর্বে মেখলি সীমা পশ্চিমে কোচর ' অন্যগ্রন্থে আছে" উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ । পূর্ব্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কোচরঙ্গ ।"

প্রাচীনকালে ত্রিপুর রাজবংশীয়েরা পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য হতে অধিক পরাক্রমশালী ছিলেন তাঁদের রাজধানী ছিল কামরূপের নিকটবর্তী "কোপিল" নদীর তীরে । রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল ত্রিবেগ। ত্রিবেগ থেকে এসে পরব'র্ত্তীকালে তাঁ কাছাড় ও শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপন করে ১৩২৯ শকাব্দ কবি শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বর ভ্রাতৃদ্বয় রাজমালায় লেখেন ঃ- " কপিল নদীর তীর ছাড়ি দিয়া; একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিয়া । সৈন্যসেনা সাথে রাজা স্থানান্তরে গেলা। বরচক্র উজানের খলংমা রহিলা । " ইহাতে জানা যায় মহারাজ দক্ষিণ ত্রিবেগ ছেড়ে বরচক্র (বরাক) নদীর তীরে খলংমা নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন ।

ত্রিবেগের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যযাতির পুত্র দ্রুহ্যু সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। রাজমালায় আছে " ত্রিবেগ স্থলেতে দ্রুহ্যু নগর করিল । কপিল নদীর তীরে রাজ্যপাট ছিল।" তাতে বোঝা যায় কপিল নদীর তীর দিয়েই একদা দ্রুহ্যু ত্রিবেগ নগরে এসেছিলেন এবং রাজ্যস্থাপন করেন । এই কপিল নদী কোথায়? পন্ডিত শীতল চন্দ্র বিদ্যানিধির মতে পুরাণের "কপিলা " বা " কপিল গঙ্গাই" এই কপিল নদী । কালিকা পুরাণের ৮১ (একাশী) অধ্যায় পাঠে জানা যায় কপিল নদীর উৎপত্তি কামাখ্যার নীল পর্বতের অন্তর্গত ব্রহ্মবিল হতে । সুতরাং দ্রুহ্যু বা তার বংশধরগণ চীন দেশের য়ুন্নান হতে কামাখ্যা পর্য্যন্ত কপিল নদীর তীর ধরে অগ্রসর হয় এবং দক্ষিণ দিকে ত্রিবেগ প্রতিষ্ঠা করে । কপিল নদী ব্রহ্মপুত্র নদীতে এসে মিশেছে । জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশের বাংলা অভিধানে ব্রহ্মপুত্র সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন- " তিব্বত মানস সরোবর হতে নিঃসৃত ও শস্পু দিহং, দিবং, লোহিত, মনাস, গদাধর, শূর্ম্মা, ধর্লা ধানেশ্রী,কপিল বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হয়ে ১৮০০ ক্রোশ অতিক্রম করার পর মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় ।'

কপিল নামের প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য আজ আর সঠিকভাবে জানা দুষ্কর । পুরাণে সগর বংশের উপাখ্যানে কপিলমুনির শাপে ৬০ হাজার সগরবংশীয় লোক প্রাণ হারায় বলে কথিত আছে । সম্ভবতঃ কপিলমুনির নামানুসারেই নদীর নাম কপিল হয়েছিল । রাজমালার রচয়িতা পন্ডিত কালীপ্রসন্ন সেন এক স্থানে বলেছেন যে " ব্রহ্মপুত্র নদের অপর নাম কপিলা হইলেও কপিল নামক আর একটি নদীর অস্তিত্ব আছে । তাহা গৌহাটির কিছু পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে । পার্জিটার সাহেবের মতে ইহার প্রাচীন নাম "কৃপা"। কারো কারো মতে রাজা প্রতর্দ্দন এখানে তাঁর রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন এবং " ত্রিবেগ"নামাকরণ করেন । আবার অন্য পক্ষ বলেন ব্রহ্মপুত্র ও কপিল মধ্যবর্ত্তী আর একটি নদী

ছিল । এবং তিনটি নদীর সঙ্গম স্থল বলে রাজধানীর নাম "ত্রিবেগ" হয়েছিল ।

ত্রিবেগের আক্ষরিক অর্থে তিনটি স্রোতের ত্রিমোহনার মিলিত স্থানকেই "ত্রিবেগ" বা "ত্রিবেণী" নামে অভিহিত করে । সে হিসাবে অনেকেই ত্রিবেগ বা ত্রিবেণীতে পার্থক্য সৃষ্টি করেন নাই । শ্রদ্ধেয় প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ভৌগোলিক অভিধান "নবজ্ঞান ভারতী" পুস্তকেও কোথাও ত্রিবেগ নগরীর উল্লেখ নাই । কিন্তু "ত্রিবেণীর" উল্লেখ আছে । ঢাকার ইতিহাসকার শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায় ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা এই তিনটি নদীর মিলন স্থান ত্রিবেণীকে "ত্রিবেগ" বলে অভিহিত করেছেন। এবং এই "ত্রিবেগ" দ্রুহ্যুর রাজ্য বলিয়া দৃঢ়মত প্রকাশ করেছেন । ঢাকার ইতিহাসের ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে "ব্রহ্মপুত্র" ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা এই নদ ও নদী ত্রয়ের সঙ্গম স্থান ত্রিবেণী বলিয়া পরিচিত । এই স্থান নারায়ণগঞ্জের বিপরীত কুলে সোনার গাঁও পরগণা অবস্থিত । কথিত আছে যযাতির পুত্রদের মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যু কিরাত ভূপতিকে রণে পরান্মুখ করিয়া কোপল বা কপিল নদীর তীরে ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নগর সংস্থাপন পূর্বক তথায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।" ঐ পুস্তকের অন্যত্র লেখা আছে যে "জনশ্রুতি, মহারাজা দ্রুহ্যুর অনন্তর বংশ মহারাজা জয়ধ্বজের সময়ে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা সুবর্ণগ্রাম আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে । তৎপূবে ইহা কিরাতাধিকৃত দেশ বলিয়া অভিহিত হইত ।" এ থেকে অনুমান করা যায় ত্রিবেগ সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত । এখানেই দ্রুহ্যুদিগের প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । অন্যদিকে ত্রিবেণী আর ত্রিবেগ যে অভিন্ন তার প্রমাণ মেলে শ্রীকেদারনাথ মজুমদার মহোদয় লিখিত "ময়মন সিংহের ইতিহাস " পুস্তকে । পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে " প্রথমেই ইশাখাঁ ত্রিবেগ, হাজিগঞ্জ ও কলাগাছিয়া নামক স্থানত্রয়ে তিনটি দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন ।" ঐতিহাসিক কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রাজমালার ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে " আরাকানের ইতিহাস 'রাজোয়াং' গ্রন্থে ত্রিপুরাকে খুরতন লেখা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক কর্ণেল ফেরার এই খুরতনকে সুবর্ণগ্রাম নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ।" পাদ্রী লং সাহেব তাঁর Analysis of the Rajmala গ্রন্থে লিখেছেন "Samser Jang obtained the Government... but the people not recognising him as the legitimate heir,he then installed, as Raja, one of the Tripura family,who resided at Sonargaon, but they still refused."

পন্ডিত শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত " ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস " পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় আছে- ত্রিবেগের অবস্থান আমরা যেরূপ পাই, তাহাতে যযাতি শাপের "যথায় নিত্য নৌরূপপল্লবের সঞ্চার আছে, সে স্থলেই তুমি সবংশে সেই অরাজ্য ভোজ শব্দ প্রাপ্ত হইবে। এই উক্তি যথার্থই বলিয়া প্রতীয়মান হয় । কারণ উল্লিখিত নদীপ্রধান স্থলে যে নৌযানের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে , তাহা সকলেরই সুবিদিত ।" পন্ডিত কালীপ্রসন্ন সেন মহোদয় রাজমালার প্রথম লহরে ত্রিবেগ সর্ম্পকে লিখেছেন - - " শতমুখী গঙ্গার সন্নিহিত সাগরদ্বীপ তৎসমীপবর্ত্তী রাজ্যের " ত্রিবেগ নাম হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দুইটি হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে । প্রথম গঙ্গার "ত্রিপথগা" নাম হতে ত্রিবেগ নামের উদ্ভব হইতে পারে । দ্বিতীয় দ্রুহ্যুর পৈতৃক রাজ্য ত্রিবেণী (প্রয়াগের সন্নিহিত স্থান) ছিল । সেই ত্রিবেণীর স্মৃতি রক্ষাকল্পে রাজ্যের নাম "ত্রিবেগ" হওয়া বিচিত্র নহে । ইহাই অধিকতর সঙ্গত কারণ বলিয়া মনে হয় ।"

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একজন গ্রীক দেশীয় বণিক সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ক একখানি গ্রন্থ

লিখেন। সে পুস্তক পরবর্তীকালে মেক্‌ক্রিন্ডেল সাহেব ও টলেমী সাহেব উভয়ে অনুবাদ করেন। এই "কিরাদিয়া" বিষ্ণুপুরাণ বর্ণিত "কিরাত ভূমি"। কিরাত ভূমি প্রাচীন কালে "কোপিল" নদীর তীরে ছিল। পরে তাহা 'ত্রিপুরা' আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। এই কিরাতভূমে দ্রুহ্য রাজ্যপাট স্থাপন করেন। কামরূপের নিকট কোপিল নদীর তীরে "ত্রিলোচন তনয় দক্ষিণ, কোপল বা কপিলা তীরবর্ত্তী রাজপাট পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরবক্রতীরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।"

"জীবনী কোষ" প্রণেতা শ্রী শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার তাঁর বিস্তৃত অভিধানে দ্রুহ্য সম্পর্কে যে আলোকপাত করেছেন তাতে আমরা শুধু ত্রিবেগ প্রতিষ্ঠাতা দ্রুহ্য ব্যতীতও একাধিক দ্রুহ্য উল্লেখ পাই। জীবনীকোষের ভারতীয় পৌরাণিক খন্ডের ৬০৭নং পৃষ্ঠায় আছে (১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির অন্যতমা পত্নী শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। (২) পুরু বংশীয় নরপতি মতিনায়ের পুত্রের নামও দ্রুহ্য। (৩) যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার অন্যতম পুত্র দ্রুহ্যকে পূর্ব দিকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। (৪) দ্রুহ্যর তনয় বভ্রু, বভ্রুর তনয় সেতু, সেতুর তনয় আরব্ধ। আরব্ধের তনয় গান্ধার।

দ্রুহ্যর পিতা যযাতি। যযাতির রাজ্য ছিল প্রতিষ্ঠানপুর। প্রতিষ্ঠানপুর এলহাবাদে অবস্থিত কিন্তু দ্রুহ্য বংশীয় সম্পর্কে আমরা কোথাও পাই চীন সাম্রাজ্যের য়ুন্নান বা গান্ধার প্রদেশ থেকেই প্রথমে তাঁরা ভারতবর্ষে আসে। রাজমালায় আছে — "ত্রিবেগ স্থলেতে দ্রুহ্য নগর করিল"। পুরাণ আলোচনায় দেখা যায় যযাতি দ্রুহ্যকে যে নির্বাসনরূপ শাপ প্রদান করেন তাতেও অনেক অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। মৎস্যপুরাণে প্রথমে গান্ধার পরে উত্তরদিকে দ্রুহ্যকে যাবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরাণে পশ্চিম দিকের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভাগবতে দক্ষিণ পূর্বদিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শীতল চন্দ্র বিদ্যানিধি পুরাণের মতদ্বৈত সম্পর্কে বলেছেন যে, আমরা যেরূপ ক্রমে পৌরাণিক বিবরণের নির্দ্দেশ করিয়াছি, দ্রুহ্যদিগের ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্থাপিত হয়েছে। দ্রুহ্য বংশীয়গণ প্রথমে পশ্চিমে গান্ধার হতে আরম্ভ করে উত্তর দিকে গিয়ে শেষে দক্ষিণ-পূর্বদিকে উপস্থিত হন। এরূপ ভাবে পুরাণের অনুসরণ করলে পুরাণ বর্ণনার সমস্ত বিরোধ যেমন দূর হয়ে যায় ঐতিহাসিক সত্যও তেমনি আশ্চার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।'

R.M Nath লিখিত The Background of Aassamese culture নামক তথ্যমূলক গ্রন্থে দ্রুহ্য সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করেছেন তার মূল্যবান উদ্ধৃতি দেওয়া হল —

"The Tippperahs have a tradition that Durhyu one of the Sons of Yayati the renowned king of Lunar dynasty of Delhi married a Bodo princess against his father's will and was disinherited. He preferred to live with his beloved in her hilly home amongst her relatives and his progeny become a ruling race. The ruling class of the Tripperas from this tradltional episode.

whatever might have been the origin of ther Royal dynasty, it is traditionally belived that one Protardon came over to Assam and established a kingdom named Trivega in about 1900 B.C.with his head-quarters on the bank of the kapili river in the present Nowgong district and the dynasty ruled for full fourteen genrations".

দ্রুহ্যরাজ্য ত্রিপুরা মান্দালয়দি ব্রহ্মা ভূখন্ড তাহা পুরু রাজ্যের পশ্চিমও বটে এবং দক্ষিণ পূর্বও বটে। পিতার নিকট হতে শাপগ্রস্ত দ্রুহ্যকে সেদিন সর্ব তত্ত্বদর্শী কপিলমুনী আশ্রয় দেন এবং তাহাকে বলেন তুমি

আমার আশ্রয়ে থেকে নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। অর্থাৎ— স্থাপয়ামাস তত্রৈব ত্রিবেগ নগরীং শুভাম্ ''— (রাজরত্নাকর)।

ত্রিবেগ নগবের স্থায়িত্ব এবং রাজত্বকাল সম্পর্কে আমরা এটুকু জানতে পেরেছি দ্রুহ্যু থেকে তাঁর পব ২৪শ স্থানীয় শত্রুজিৎ পর্য্যন্ত ত্রিবেগ থেকেই রাজত্ব করেছেন। সপ্তগ্রামেব পূর্বাপর ইতিহাসে জানা যায় " শত্রুজিৎ নামক এক রাজা এস্থানে রাজত্ব করতেন। তাহা কবি কৃষ্ণরামকৃত ষষ্ঠিমঙ্গল গ্রন্থে আছে। ` শত্রুজিৎ ' রাজার নাম তার অধিকারী। বিবরণে কত গুণ বলিতে না পারি।'' কালপ্রবাহে ভারতের সে প্রাচীনতম রাজা বর্তমানে বিলুপ্ত। উপরিউক্ত ত্রিপুরার দ্রুহ্যু বংশের ৩১ (একত্রিশ) স্থানীয় রাজা শত্রুজিৎ আর সপ্তদ্বীপের রাজা শত্রুজিৎ একই ব্যক্তি বলে আমাদের ধারণা। সে সময় দ্রুহ্যু বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল সগরদ্বীপের কপিলাশ্রমের নিকট। যা হোক, দ্রুহ্যুর অষ্টমস্থানীয় প্রচেতার একশত পুত্র রাজধানী পরিত্যাগ করে বিভিন্ন দেশে গমন করে। প্রচেতার জ্যেষ্ঠপুত্র পরাচি যাবার পূর্বে তার পুত্র পরাবসুকে ত্রিবেগের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে যান। শত্রুজিৎ পরাবসুর অধঃস্তন চতুর্দ্দশ স্থানীয়। শত্রুজিতের পুত্র প্রতর্দ্দন রাজা হয়ে কিরাত দেশ জয় করেন। এবং তাঁর বিজিত রাজ্যের রাজধানীব নাম পরিবর্তন না করে ত্রিবেগ নামই রাখেন। প্রতর্দ্দনের অধস্তন চতুর্দ্দশ স্থানীয় মহাবাজা ত্রিপুবেব শাসনকালে রাজ্যের নাম ' ত্রিবেগ' স্থলে' ত্রিপুরা ' হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ আলোচনায় আমরা পেয়ে থাকি প্রচেতার পুত্রগণের পূর্ব্ব পর্যন্ত কেহই ত্রিবেগ পরিত্যাগ করে অন্যত্র রাজ্য স্থাপন করেন নাই।

বিদ্যানিধি শীতলবাবুর মতে " খৃষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দেও গান্ধারে শ্যান্দিগকেই অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই, তখন দ্রুহ্যু সন্তানগণ যে তৎপূর্বেই গান্ধারবট্ট পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সহজেই তাহা অনুমিত হইতে পারে।— তাহাদের এই গান্ধারবট ত্যাগ সহস্রাধিক খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে হইযা থাকলে তদ্বারা তাঁহাদের ত্রিবেগে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় সম্বন্ধে তাঁহাদের বংশধারার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার অনেকটা সমর্থনই হয়।' শীতলবাবুর মতের খন্ডন করেন পন্ডিত কালীপ্রসন্ন সেন। তিনি বলেন — " হস্তিনাপুরের ক্ষত্রিয়গণের সহিত দ্রুহ্যু বংশের জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহারা পুরুবংশীয়। যাঁহারা সুন্দরবনস্থিত ত্রিবেগ রাজধানী পরিত্যাগ করিযা অন্যত্র গমন করিযাছিলেন, তাহাদেরই কোন ব্যক্তি গান্ধারে উপনিবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুন্দববনস্থ ত্রিবেগ যাঁহারা (পরাবসুর সন্তানগণ) তাঁহাদের সহিত গান্ধারবাসীগণের পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ বিছিন্ন হইয়াছিল। সুতরাং গান্ধারবাসী দ্রুহ্যু সন্তানগণ চীনদেশের " গান্ধারবট'' গিয়া থাকিলেও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী ত্রিবেগের সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্রব ঘটিতে পারে না। সুন্দরবনের ত্রিবেগ হইতে যে দ্রুহ্যু সন্তানগণ ব্রহ্মপুত্র তীরে আগমন করিয়াছিল। দ্রুহ্যু সন্তানগণের গান্ধারবট পরিত্যাগের কাল "সহস্রাধিক খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এবং এই স্থান পরিত্যাগের পরেই তাঁহারা ' ত্রিবেগ' গিয়াছিলেন। যদি ত্রিবেগে ব্রহ্মপুত্র তীরে রাজ্য স্থাপনের কাল দেড় সহস্র খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ নির্দ্ধারিণ কবা যায় তথাপি এই রাজধানীর প্রাচীনত্ব সার্ধ ত্রিসহস্র বৎসরের অধিক হয না। প্রকৃত পক্ষে ত্রিবেগের রাজ্যপাট গান্ধারবট্ট বা বা য়ুন্নান উপনিবেশের বহু পূর্ববর্ত্তী।''

মহাভারত, পুরাণ, রাজমালা প্রভৃতির মতানুসারে ত্রিপুরা রাজবংশের একটা আনুমানিক তালিকা প্রণয়ন করলে দেখা যায় ১৪৬৭ খৃষ্টপূর্ব্ব থেকে ১৩০০ খৃষ্টপূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজবংশ ত্রিবেগে রাজত্ব করে, খলংমাতে রাজত্ব করে ১৩০০খৃষ্টপূর্ব্ব থেকে ১৫০ খৃষ্টপূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় ৫২ পুরুষ এবং রাজা বিথার পর্য্যন্ত। ১৫০খৃষ্ট পূর্ব্ব থেকে ৫৯০খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছাম্বুলে রাজত্ব করে এবং ৫৯০ খৃষ্টাব্দ হতে

বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করে। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ভবিষ্য পুরাণে কপিল তীরের রাজ্যের যে অভ্যুত্থানের উল্লেখ আছে তাহা ছাম্বুলের রাজত্বকালের সঙ্গেই মিলে।

ত্রিবেগ রাজ্য আজ আর নেই। বহুকাল পূর্বেই তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অচ্যুত চরণ তত্ত্বনিধি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ "শ্রীহট্টের ইতিহাসে" লিখেছেন "দ্রুহ্য বংশের ত্রিপুর নামে এক নৃপতি কিরাত ভূমে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের অপেক্ষা তিনি ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রাজধানী পূর্ব্বকালে কামরূপের সন্নিকটে "কোপিল নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সে প্রাচীন রাজ্যের রাজধানীর নাম ত্রিবেগ। পরে কালের ক্ষয়ে এই ত্রিবেগনগরী বিলুপ্তি প্রাপ্ত হয়ে যায়। এবং কালক্রমে বর্ত্তমান কাছাড় ও শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজধানী স্থাপিত হয়।"

আচার্য্য দীনেশ চন্দ্র মহোদয় তাঁর বৃহৎবঙ্গ গ্রন্থে লিখেছেন – "ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে যত রাজা বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম। আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম আর কোন বংশে একাধারে পাই না। এই বংশের আদি পুরুষ দ্রুহ্য কপিল নদীর তীরে ত্রিবেগ নগরী স্থাপন করেন। লৌকিক বিশ্বাসে এই বংশ কিরাত বলিয়া আখ্যাত হইতেন। ত্রিপুর রাজের অনাচার ও অনার্য্য শ্রেণীতে বিবাহাদির জন্য এই বংশে কিরাতও ঢুকিয়াছিল। এই কপিল আশ্রম "সাগর" নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সাগর সন্নিহিত বিস্তৃত ভূ-খন্ড পাঁচটি সমৃদ্ধ নগরী ও দুই লক্ষ লোক সহ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে জল প্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছে।"

পরিশেষে একটি বিষয় লিখেই প্রবন্ধ শেষ করছি। রাজমালায় বর্ণিত বিষয়ে বিশেষ করে প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সব ঐতিহাসিকরা নিতান্তই সন্দিহান। যযাতির পুত্র দ্রুহ্য থেকে যে ধাবা আধুনিক কাল পর্য্যন্ত টানা হয়েছে তা ভারতের ব্রাহ্মণ সমাজের সৃষ্ট বলেই মনে হয়।

মহারাজা বীরচন্দ্র ঃ জাত-পাত আন্দোলন ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা দেখা দেয়। এ সম্পর্কে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৩রা শ্রাবণ 'রূপ ও রঙ' পত্রিকা লিখেছিল জাতিভেদ ভারবর্ষের মাটির গুণ, ভারতবাসীর শোণিত সম্পর্ক। ভারতবর্ষে জাতিভেদ উঠাবার চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র ।"

এই জাতিভেদ ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে সমাজের প্রতিটি স্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চামার, ডোম প্রভৃতি জাতের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে। তাই এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ঘরে অন্নজল গ্রহণ করে না । এমন কি বৈবাহিক সম্বন্ধও অচল। এবং এই জাতিভেদ প্রথার সবচেয়ে মারাত্মক দিকটা ছিল — - একে অন্যের জল স্পর্শ করত না, করলে তার স্ব-সমাজে তাকে একঘরে করা হত ।ধোপা - নাপিত তার কাজ করত না । এবং পুনরায় প্রায়শ্চিত না করে সমাজে ফিরে আসতে পারত না ।এই যে জাতপাতের আন্দেলন তা থেকে ত্রিপুরা রাজবংশও বাদ পড়েনি।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যেব বাজত্বকাল। সে সময় অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলেব পন্ডিতগণ ত্রিপুরার রাজবংশকে রাজবংশী বলে অভিহিত করতেন ।অপরদিকে ত্রিপুরার রাজবংশ নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করতেন।এবং তাঁরা বলতেন তাঁরা চন্দ্রবংশ জাত । কিন্তু সেদিন অবিভক্ত বাংলার পন্ডিত সমাজের একটা বৃহৎ অংশ তাদেরকে ক্ষাত্রয় বলে স্বীকার করতেন না । কিন্তু অপরদিকে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ অর্থলোভে রাজ পরিবাবে অন্নগ্রহণ করে তাঁদেব চন্দ্রবংশীয় বলে স্বীকৃতি দান করেছিলেন। সুতবাং পক্ষে - বিপক্ষে দু'পক্ষ থাকায় সেদিন আন্দোলনটা খুব জোবদার হয়েছিল।

সেদিনেব সে আন্দোলন সম্পর্কে রাজবিহারী দাস প্রণীত 'জীবন-কাহিনী'র প্রথম ভাগে ১৮২ পৃষ্ঠা থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে দিলাম --

"১৮৮২ খৃঃ অব্দে, মহারাজা বীরচন্দ্র দেব বর্ম্মন মাণিক্য বাহাদুর কতিপয় স্বার্থপর কুচক্রি ব্যক্তিব কুপরামর্শে পর্ব্বতবাসী সমগ্র টিপরাজাতিকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুত বলিয়া প্রচার করেন এবং রাজপরিবারের লোক বলিয়া তাহাদের সংস্পৃষ্ট জল সকলকে পান কবিতে দেন । তদনুসারে কতকগুলি অর্থগৃধ্নু পন্ডিত পুঙ্গব ও চাকুরী প্রার্থী উমেদার, ত্রিপুরাজাতির সংস্পর্শ জলসহ কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করেন। ইহা লইয়া ত্রিপুরা, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টবাসী হিন্দুগণের মধ্যে দাবানল প্রায় ত্রিপুর জাতির জাতি ঘটিত এক ঘোরতর সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং ভীষণ সমাজ - যুদ্ধে মহারাজা বাহাদুর বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও পারজিত হয়েন। তাহাব কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ পয্যর্ন্ত জলাচরণ ভযে ত্রিপুরা হইতে পলায়ন করে। এই জলাচরণ ব্যাপার উপলক্ষে অপবিমিত অর্থ ব্যয়িত হওয়ায়, ঋণজালে রাজ-সংসার ডুবুডুবু হইয়া উঠে ।"

এই আন্দোলনকে কেন্দ্র কবে সেদিন ত্রিপুরা রাজ্যে যে কযটি প্রহসন লিখিত হয়েছিল — তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জলযোগ' 'প্রহারেণধনঞ্জয়' 'ত্রিপুরা শৈল' ও 'গোবর্ধন' । 'জলযোগ' প্রহসনটির লেখক ছিলেন ঈশানচন্দ্র মুস্তফী । ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা থেকে অভয়াচবণ দাস ইহা প্রকাশিত করেন। জলযোগেব

ভূমিকায় লেখক লিখেছেন ঃ--- " জলযোগ' অর্থাৎ পশ্চিমপুরের পন্ডিতদিগের কিঞ্চিৎ জলপান " নামকরণ থেকেই বুঝা যায় যে প্রহসনের দৃষ্টিকোণ । ত্রিপুরা রাজবংশ শূদ্র পর্য্যায়ের বলে ধরে নেয়া হয়েছে এবং জাতপাত বিষয়ে সন্দেহ বা বিতর্কের অবকাশ রাখা হয়নি । বরং গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেই সাংস্কৃতিক আগমনই প্রকাশ পেয়েছে।

'জলযোগ' প্রহসনের কাহিনীটি নিম্নরূপ - পূর্বপুরের রাজা দিলীপচন্দ্রের মনে শান্তি নেই । তিনি জন্মাবধি জেনে আসছেন তাঁরা জাতে ক্ষত্রিয় । কোন বইয়ে নাকি লেখা আছে -- সে কথাও তার মন্ত্রীর কাছ থেকে শুনা। মন্ত্রী চাক্লায় গিয়েছিলেন রাজকার্য্যের উপলক্ষে । সেখানে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল --- কোন বইয়ে সে নাকি পড়েছে যে আমাদের মহারাজার জল অস্পর্শনীয়, এমন কি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের গৃহে প্রবেশ করলেও খাদ্য দ্রব্যাদি অশুচি হয়।

মন্ত্রীরা চিন্তায় পড়ল --- এসব কথা প্রকাশ হলে রাজ্যেরপক্ষে বিপদ -- তাই প্রতিবিধান চাই । সে সময় রাজ্যের নায়েব বলল -- প্রতিবিধান করতে হলে ব্রাহ্মণ সমাজের অনুমতি লাগবে । মন্ত্রীরা বললেন তবেত সমাধান সহজ হয়ে গেল । কেননা পশ্চিমরপুরের ব্রাহ্মণরা একবার বলেছিল ' সমাজ কি - আমরাই সমাজ' । এদিকে রাজা বিষণ্ণ -- তিনি মন্ত্রীদের ডেকে বললেন ঃ-- ' আমরা যযাতির সন্তান চন্দ্রবংশোদ্ভব। আজ কোথা থেকে এসব কথার সৃষ্টি । দেশের বিদ্যারত্ন সার্বভৌম, শিরোমনি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যুক্তি দ্বারা আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করেছেন -- সুতরাং নগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে খবর দাও। যেহেতু পশ্চিমপুরের সব পন্ডিতই তাকে মান্যতা করে।

নগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন এবং কথা দিলেন এর প্রতিবিধান করবেন এবং তিনি নিজেও বিশ্বাস করেন রাজার পূর্ব-পুরুষেরা ক্ষত্রিয়।

এরপর নগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আবৃত নগরের' অন্তঃপাতী ' অশনিপাত ' গ্রামের পন্ডিত নির্মল শশধর তর্করত্নকে চিঠি দ্বারা জানালেন যে পূর্বপুরের মহারাজা তার রাজ্যে একটি সুধাসভা স্থাপন করতে চান , সুতরাং তিনি যেন নির্দ্দিষ্ট দিনে পশ্চিমপুরের ও স্রোততটের পন্ডিতদের সঙ্গে নিয়ে এখানে আসেন। অপরদিকে নগেশবাবু সন্ত্রীকে লিখলেন -এ সুধীসমাজ সম্মেলনে কম পক্ষে দশ হাজার টাকা খরচ হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই ত্রিনেত্র তর্কালঙ্কার, মধূসূদন আহ্লাদ সার্বভৌম, জনার্দ্দন বিদ্যারত্ন প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে নির্মল শশধর নগেশবাবুর বাড়িতে আসেন । তখন নগেশবাবু তাদের কাছে সম্মেলনের উদ্দেশ্য খুলে বললেন। মহারাজ যে ক্ষত্রিয় একথা সকলেই স্বীকার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন । কিন্তু মহারাজের সেখানে আহার্য গ্রহণের ব্যাপারে নীরব রইলেন । পন্ডিতদের ভয় স্রোততটের ব্রাহ্মণরা মান্‌লেও পশ্চিমপুরের ব্রাহ্মণরা নাও মানতে পারেন । এরপর পন্ডিতদের মধ্যে অনেক কথাই হয় -- এরপর যখন তাঁরা শুললেন নগদ উত্তম রকমের বিদায়ের কথা, তখন সবাই আহার্য্য গ্রহণে বাজি হলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে সমস্ত পন্ডিতরা পূর্বপুরের রাজভবনে এসে উপস্থিত হন । পন্ডিতরা এসে রাজাকে নবরূপে অবতার বলে আখ্যায়িত করেন । এরপর সভা বসে । সভায় নির্মল শশধর সভাপতি হন। এবং সভায় সর্বসম্মর্তি ক্রমে রাজাকে যযাতির বংশধর বলে স্বীকার করে নেয়া হয় । এরপর জলখাবার প্রসঙ্গে তর্কবাগীশ বলেন --- " অচ্ছা " জল খাব, তাতে দোষ কি ? জল স্বয়ং নারায়ণ ।" অপর পন্ডিত বললেন - গোমতীর ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে পরস্পর সংশ্রব আছে সুতরাং গোমতির পাবকত্বত্ত আছে । এরপর লোভার্ত পন্ডিতেরা রাজকীয় খাদ্য সামগ্রী পেয়ে ভূরিভোজন কবেন এবং প্রচুর বিদায়

নিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করতে করতে যে যার স্থানে চলে গেলেন।

এ জলযোগেব সংবাদ ক্রমে ক্রমে দেশময় বাষ্ট্র হয়ে পড়ল ।এদিকে নির্মল শশধরের মেয়ে ঋতুবতী হওয়ার পর ষোলদিনেব মধ্যে কন্যাকে বিবাহ দিতে হবে । কিন্তু পাড়া-পড়শীরা পানসুপারী গ্রহণ করে না। মেয়েরা পর্যন্ত বিপক্ষদলে যোগ দিয়েছে। তার টোলের ছাত্ররাও একে একে চলে যায়। অপরদিকে আবৃতনগরীর কোর্টে বিপক্ষের উকিলেরা জেরায জনার্দ্দন পন্ডিত সব কিছু প্রকাশ করে দেন । নগেশবাবু আক্ষেপ করেন। পন্ডিতরাই আশা দিয়েছিলেন কিন্তু হিতে বিপরীত হল । চারদিকেই শত্রু।পরিত্রাণ পাবার পথ নেই ।কেবল ভরসা পার পাবার মুখুয্যেরা যদি রক্ষা করেন ।

এখানেই প্রহসনটি শেয ।প্রহসনটি পড়লেই বোঝা যায় পূর্বপুরের রাজা দিলীপচন্দ্র, অর্থাৎ ত্রিপুবার রাজা বীরচন্দ্রের প্রতীক ।আবৃতননগরী অর্থাৎ ঢাকা, কারণ সেদিন বীরচন্দ্রের আমলে জাত-পাতের আন্দোলনে ঢাকাব এবং সিলেটের ব্রাহ্মণ সমাজই বিপক্ষের ভূমিকায় ছিলেন ।

ত্রিপুরায় এই জাত পাত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সে সময় আরও কয়েকটি ‘ প্রহসন’ লেখা হয়েছিল। যেমন , ১। প্রহারেণ ধনঞ্জয’ (১৮৮৪খ্রীঃ) লেখক – অম্বিকাচরণ ২। ত্রিপুরা শৈল নাটক’ (১৮৮২ খ্রীঃ) শরৎচন্দ্র গুপ্ত ।৩। গোবর্ধন (১৮৮৩খ্রীঃ) লেখক অজ্ঞাত ।

সবগুলি প্রহসনের বিযয়বস্তু এক । ‘‘ত্রিপুরার রাজার হাতে জল চলে না। টাকা খেয়ে অনেক আগরতলায় গিয়ে বাজাব পক্ষে বিধান দিয়েছেন। তাঁদের পন্ডিত সমাজ একঘরে করেছেন । অনেকে প্রায়শ্চিত করে জাতে উঠেছেন । অনেক জেদের বশে প্রাযশ্চিত না করে অসুবিধা ভোগ কবেছেন ।’’ উনবিংশ শতাব্দীব বাংলা প্রহসন - জয়ন্ত গোস্বামী)

‘গোবর্ধন’ প্রহসনটিতে ত্রিপুরার জাতপাত আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কথাই আছে ।যেদিন এ প্রহসন সম্পর্কে calcutta gazette পত্রিকায় লিখেছেন " The work is directed aginst the Rajah of Hill Tippurah beign written in connnection with the case question, which has thrown the Hondu community of Dacca Vikrampur, and other places into aferment, and divided it into two betterly hostile parties"

যদিও পরবর্তীকালে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায় এবং ত্রিপুরার রাজবংশকে ক্ষত্রিয় বলেই সবাই স্বীকৃত দেয় এবং সে স্বীকৃতি আজও বহমান। উনবিংশ শতাব্দীর যে আন্দোলনের কথার সাক্ষ্য স্বরূপ বাংলা সাহিত্যের এই প্রহসনগুলিই যথেষ্ট ।

সংবাদসূত্র ঃ-

১। ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা (১৮৮৩খ্রীঃ) ।

২। বৈদিক সমস্যা সমাধান – রণেন্দ্র কুমার রায় চোধুরী ।

৩। সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন - জয়ন্ত গোস্বামী।

৪। ত্রিপুরাবার্তাবহ (১২৯০ সাল) ।

সংহতির দৃষ্টিকোণে ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতি-

"দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" - সংহতির সম্পর্কে উপরের কথাটিই যথেষ্ঠ বলে আমার মনে হয়। যে কোন জনগোষ্ঠীব অপর কোন গোষ্ঠির আচার-ব্যবহার, ভাষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য শিল্পের আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে সমতা, যে একাত্মোবোধ গড়ে তুলতে পারে সেখানে সংহতি আপনভাবেই স্থান করে নেয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই ত্রিপুরার মিশ্র - সংস্কৃতি ত্রিপুরার সমাজ জীবনে সংহতির দ্বার খোলে দিচ্ছে। এবার আস যাক মিশ্র সংস্কৃতির কথায়। ত্রিপুরার মিশ্র-সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, রত্নফা যখন মানিক্য উপাধি নিয়ে ত্রিপুরায় ফিরে এলেন তখন তিনি তাঁরসঙ্গে নিয়ে এলেন ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের, যাদের সহযোগে সেদিন ত্রিপুরায় গড়ে উঠেছিল এক মিশ্র-সংস্কৃতি। যেহেতু পন্ডিতদের দ্বারা আনীত সংস্কৃত সাহিত্যে ও উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির আমদানী। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমাদেব ভুললে চলবে না যে আমাদের ত্রিপুবার সে সময়ে সীমানা ছিল ব্রহ্মদেশের প্রান্তসীমা থেকে শ্রীহট্ট, কাছাড়, ঢাকার কিছু অংশ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি নিয়ে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে হিন্দু - বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন এখানে মিলেছে।

ত্রিপুরার দেবালয় সমুহে হিন্দু - বৌদ্ধ ও মুসলমান স্থাপত্য রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। তাই দেখা গেছে তিনটি ধর্মের তিন রীতি হলেও পূজাঅর্চনায় ব্রাহ্মণ রীতির সঙ্গে আদিবাসীর উৎসবেব মিশ্রণ ঘটেছে নানাভাবে। শিবশক্তি পরে বৈষ্ণব রাজাদের দেব -দেউলের মধ্যে শাক্তদেবতা অপেক্ষা উগ্রদেবতা মন্দিরের সংখ্যা কম কিন্তু শাক্ত দেবতার মন্দিরগুলির অনেকটি বিলুপ্তপ্রায়, তাই দেখি চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা করা ফোঁটাফাটা তিলকধারী হলেও বলিদানে তাঁদেব কোন আপত্তি থাকে না।

বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরারাজ্যের যোগ অনেক দিনেব। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক দিয়েই শুধু নয়, মূল ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ কয়েক শতাব্দীর।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ তিপরা ও বিয়াংদের ভাষা ভোটবর্মী গোষ্ঠির অন্তর্গত বড়ো-পরিবার ভুক্ত। এসব ভাষার লিখিত রূপ নেই, উপরন্তু এসব ভাষাভাষীরা ক্রমে বাংলাভাষা গ্রহণ করার দিকে ঝুঁক ছিলেন, এবং ত্রিপুরার রাজপরিবার তাঁদের সংস্কৃতি ও আদালতের ভাষা হিসেবে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছিল। সে কারণে যে মিশ্র-সংস্কৃতি ভাষার মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাই পরবর্তী কালে দুই সংস্কৃতির মধ্যে ভাষার মাধ্যমে সেই ভাষাভাষিব সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে দ্রুতগতিতে এবং চাকলা রোশনাবাদের বিভিন্ন জেলার কথ্য বাংলা ভাষার ও প্রভাব পড়েছিল নানাভাবে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে।

এ ব্যাপারে এ কথা তো সবাই জানেন,রবীন্দ্রনাথও একদা ত্রিপুরাব বাংলাভাষা সাহিত্য চর্চার এবং আইন ও আদালতে বাংলা প্রচলনেব প্রশংসা করেন। তিনি ত্রিপুবার চার রাজার রাজত্বকালে নিজেকে জড়িয়ে রাখায় উভয়দিক থেকেই বাংলাভাষা উৎকর্ষ লাভ কবেছে। বাংলাভাষাব প্রভাব ত্রিপুবাব সাহিত্যকে উচ্চস্তরে নিয়ে যায়। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে পাই রাজকুমারী অনঙ্গ মোহিনী দেবী কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থান কবে নিয়েছেন। শিল্পী হিসাবে ঠাকুর ধীবেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মন "রমেন্দ্র চক্রবর্তী" নলিনীকান্ত মজুমদার সমগ্র পৃথীবীতে গৌরবের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের

শিল্পকর্মে ত্রিপুরার নিজস্বরীতি ধরা পড়েছে। সঙ্গীতের দিক থেকে মহারাজ বীরচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনিলকৃষ্ণ, সুরেশকৃষ্ণ, বিপিন দেববর্মা, পুলিন দেববর্মা, বঙ্কিম দেববর্মা সবাই ত্রিপুরার সঙ্গীতকে বহিঃ ত্রিপুরায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। কুমার শচীন দেববর্মা ত্রিপুবার নিজস্ব সুরকে গানের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার প্রতিটি গ্রামে বা ত্রিপুরার পাহাড়ের প্রতিকন্দরে পৌঁছে দিয়েছেন।

অনেকের মতে ত্রিপুরার রাজারা শৈবধর্মী। কিন্তু আমাদের মনে হয় কোন নির্দ্দিষ্ট পথ রেখায় ত্রিপুরার রাজাদের ধর্ম চিন্তা চলেনি। তাই ত্রিপুরার ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আওতায় ঊনকোটি, দেবতামুড়া বড়মুড়া ইত্যাদি পাহাড় গাত্রে নানা ধরনের স্মৃতি রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন দেবদেবীর মঠ ও মন্দির মসজিদ ও রয়েছে। অপরদিকে মন্দির শিল্পে দেবদেবীর রূপাকৃতি ও পূজা পদ্ধতির মধ্যে কোন না কোন বিশেষ ক্ষেত্রে হিন্দু - মুসলমান বৌদ্ধ আদিবাসী ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রভাব ও সহাবস্থান আমাদের চিন্তার খোরাক যোগায়। ত্রিপুরার রাজাদের হিন্দুধর্মের প্রতি এত আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও মন্দিরগুলির মধ্যে বৌদ্ধ-সংস্কৃতির প্রভাব কি করে সম্ভব হল তা আমাদের প্রশ্ন থেকে যায়। তবু বলা যায়, সংস্কৃতির মিশ্রণহেতু ত্রিপুরার মন্দিরশিল্পে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতির রেখাপাত হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই এবং এখানেও সংহতির প্রশ্ন এসে যায়।

উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, মহাদেব বাড়ির মন্দির, হরিমন্দির জগন্নাথ মন্দির, আগরতলা লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির ও অন্যত্র যে সব মন্দির উপরেব গম্বুজগুলো আমাদের চোখে পড়ে তা বৌদ্ধস্তূপজাত বলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে স্তূপগুলো ঠেস্‌নার সাহয্যে যে ভাবে ‘ চালার উপর’ স্থাপিত যা মুস্‌লিম স্থাপত্য শিল্পকে মনে করিয়ে দেয়। এই ‘ঠেস্‌না’ ও চালাপদ্ধতি বিশেষজ্ঞরা মুসলমানী ঢঙ বলে উল্লেখ করেছেন। যে সকল মন্দিরে নাটমন্দির রয়েছে তাকে কেউ কেউ উড়িষ্যা প্রভাব বললেও এরমধ্যে বাংলা গণপঞ্চায়েতের অনুকরণের প্রশ্ন থেকে যায়। আগরতলা রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন জগন্নাথ মন্দিরটি কিন্তু ত্রিপুরার মন্দিরগুলোর মধ্যে একদম আলাদা ধরনের। এ ধরনের মন্দির সাধারণত বরফপ্রধান দেশে তৈরী হয়ে থাকা পিরামিড আকৃতিতে মন্দিরটি সোজা উপর দিকে উঠে গেছে। যেখানে গীর্জার অনুকরণের প্রশ্নে আমাদের মনে কৌতুহলের সৃষ্টি করে। সোনামুড়া বিভাগের এক বৃহদাকার মস্‌জিদ ছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মস্‌জিদ নেই। তাই বলতে হয় ত্রিপুবার মন্দিরশিল্পে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ও বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির যে সংমিশ্রণ ঘটেছে তা ভারতের আর কোন রাজ্যে দেখা যায় না বলে বিশযজ্ঞদের অভিমত ।

ত্রিপুরার দেবদেবীর মুর্তিতে পূজা - আর্চার মধ্যেও মিশ্র - সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। ঊনকোটি তীর্থ শৈবতীর্থ বললেও মূলতঃ এটা শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য সবারই তীর্থ এবং তন্ত্রপূজার সন্ধানও এখানে মেলে।

তা ছাড়া তন্ত্রসাধনার সঙ্গে যুক্ত বলেই একানকার আদিবাসী জনসমাজ এ তীর্থকে আন্তরিকতায় গ্রহণ করতে পেরেছে। প্যারীমোহন দেববর্মা লিখিত গ্রন্থ ঊনকোটি তীর্থে, আছে তীর্থটির প্রবেশ পথে মূর্তি নির্মাতা “ কালু কামারের উল্লেখ দেখি। ”

এই কালু কামার সুন্দরবনের বাঘের দেবতা কালু রায় বা এরই অনুগত ভাবনায় স্থানীয় অন্য কোন বন্যপ্রাণীর দেবতা কিনা তা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন থেকে যায়। ঊনকোটি তীর্থ ত্রিপুরার প্রায় সকল সম্প্রদায়ের কাছেই সমভাবে পূজিত হচ্ছে। উদয়পুরে মহাদেব বাড়িতে পাঁঠা বলিদান, ত্রিপুরা সুন্দরী

মন্দিরে অথবা চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়িতে ডিম উৎসর্গ দেবার রীতি আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। তান্ত্রিক মতে ডিম উৎসর্গ করা হয়। চতুর্দ্দশ দেবতা এখানে রাজাদের কুলদেবতা বলে পরিচিত। মূর্তিগুলির মুখের গড়নে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব হয়তো কারো কারো দৃষ্টিতে পড়তে পারে। হিন্দু নামা- করণের সঙ্গে মূর্তিগুলির আদিবাসী নামকরণ ও আছে। চন্তাই যিনি এদেবতার প্রধান পূজক, ইনি আদিবাসী গোষ্ঠিব একজন। মূল মন্দিরে শালগ্রাম শিলার পূজার যে রীতি হিন্দুধর্মের অনুসরণে চালু হয়েছে সেটা অর্বাচীন কালের। এ দেবতার অঙ্গ পুজা হিসাবে খার্চি ও কের মূলতঃ মুদ্রা পূজার লক্ষণ কারোব আপত্তি না থাকলে পূজায় মুসলমানী প্রভাব রয়েছে। কেননা অলৌকিক তন্ত্রমন্ত্রে ফকির দরবেশের ভূমিকা পূর্বে ত্রিপুরায় কম ছিলনা। সাম্প্রতিক কালে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা বা খার্চি পূজা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করেছে।

তবেই দেখা যায় মিশ্র সংস্কৃতির মাধমে একজাতি বা - গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য জাতি বা গোষ্ঠীর যে সাংস্কৃতিক মিলন হয়েছে তাতো জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংহতির পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

ত্রিপুরার মুদ্রার ইতিহাস

প্রাচীন মুদ্রা কোন ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান সহায়ক উপাদান। যে দেশের ইতিহস লিখিত নেই, সেই ক্ষেত্রে প্রাচীন মুদ্রা হল লুপ্ত ইতিহাস রচনার অপরিহার্য্য প্রাধান উপকরণ। ত্রিপুরার বিভিন্ন সময়ে রাজন্যবর্গ তাঁদের নামাঙ্কিত বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা তৈরী করেছেন। "রাজমালা"র রাজসংস্করণের সম্পাদক পন্ডিত কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের মতে ত্রিপুরা রাজবংশের ১৪৫ সংখ্যক রাজা রত্নফা প্রথম "মাণিক্য" উপাধি গ্রহণ করেন। এবং ১২৮৬ শকাব্দে (১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে) তিনিই প্রথম মুদ্রা তৈরী করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজগণের পনের জনের নামের মুদ্রার অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

সাধারণত ত্রিপুর রাজগণ তাঁদের রাজ্যাভিষেক, দেশ জয়, তীর্থদর্শন প্রভৃতির স্মৃতিতে কিংবা কোন বিশেষ স্মরণীয় কার্য্য সম্পাদন করলে মুদ্রা তৈরী করতেন। এই মুদ্রা তৈরীকে "জবপ" মারা বা "মোহর মারা বলা হত। ত্রিপুবার মুদ্রার রাজার নামের সঙ্গে পাটরাণীর নাম মুদ্রিত করা লৌকিক প্রথা হিসাবে গণ্য ছিল। আবার যে সব নৃপতির একাধিক রাণী থাকতো তাঁরা নিজের নামের সহিত প্রত্যেক রাণীর নাম যুক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা তৈরী করতেন। ধন্য মাণিক্যের আমলে দেখা যায় "১৪১২" শকের মুদ্রার রাণীর নাম আছে। কিন্তু শকাব্দহীন মুদ্রায় শুধু রাজার নাম আছে। এতে বুঝা যায় ধন্য মাণিক্য সিংহাসনে আরোহন করার পরে বিবাহ করেন। রাজমালায় আছে,—

"এ বলিয়া মন্ত্রীসবে স্নান করাইল
সিংহাসনে বসাইয়া প্রণাম করিল
লোকে ধন্য বলিয়া তখনে কহিলেক
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা হইল অভিষেক
বড় সেনাপতি দিল আপনার কন্যা
মহারাণী কমলা নাম আপনার ধন্যা।

(রাজমালা ২য় লহর ৮ পৃষ্ঠা)

এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার যে সব মুদ্রার খবর পাওয়া গেছে সেগুলি প্রধানতঃ রূপায় তৈরী। আকৃতি গোলাকার। ও গুলি বাংলার সুলতানদের "তনখা" (টঙ্কা বা টাকা) মুদ্রার নমুনায় তৈরী হত। মুদ্রাগুলির ওজন প্রায় ১৬৫ গ্রেণ। কল্যাণমাণিক্য, গোবিন্দমাণিক্য, ইন্দ্রমাণিক্যর কৃষ্ণমাণিক্যের কয়েকটি এক-অষ্টমাংশ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। স্বর্ণমুদ্রা হিসাবে বিজয়মাণিক্য, গোবিন্দ মাণিক্যের কৃষ্ণ মাণিক্যের মুদ্রার খবর পাওয়া গেছে। তামার তৈরী ত্রিপুরার কোন মুদ্রা এখন পয্যর্ন্ত আবিষ্কার হয়নি। ডঃ অমরনাথ লাহিড়ী বলেনঃ— "উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের প্রাক-মধ্যযুগীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে ত্রিপুরার মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক কালে একমাত্র ত্রিপুরার মুদ্রাতেই চিত্র (device) আছে এবং ভারতীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে শুধু এগুলিতেই রাজাব নামের সহিত প্রায় নিযমিত ভাবেই রাজমহিষীর নামও দেখা যায়।

ত্রিপুরার মুদ্রার মুখ্যদিকে (obverse) যে লিপি (legend) আছে, তাহা সংস্কৃত ভাষায় বাংলা অক্ষরে উৎকৃষ্ট। এই লিপির প্রথমাংশে রাজার বিরুদ্ধ (epithed) এবং দ্বিতীয়াংশে রাজা ও রাণীর নাম থাকতো। দৃষ্টান্ত ঃ— " শ্রী শ্রী বিজয় মাণিক্য দেব শ্রীসরস্বতী মহা দেব্যৌঃ।"

১৩১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৯১১ খৃষ্টাব্দে) উদয়পুর বাজার সংস্থাপন করার সময় মাটির নিম্নে একটি পাত্রে পঞ্চাশটি রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্তি সম্পর্কে লিখেছিলেন " উদয়পুরে মৃত্তিকার নিম্নে যে কতকগুলি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। তাহার সংখ্যা ৫০; তন্মধ্যে আদি রত্নমাণিক্যের সময়ের ২০টি এবং ধন্যমাণিক্যের সময়ের ১৭টি। অবশিষ্ট মুদ্রাগুলির লেখা পড়া যায় নাই। লেখাগুলি পারস্য ভাষায় বলিয়া মনে হয়। মহারাজ রত্নফা গৌড়ের অধিপতির সাহায্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ১১৮৬ সালে বিজয়ী হন এবং ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করেন। মহারাজা রত্নমাণিক্য স্বকীয় শাসন সময়ে নানা প্রকার মুদ্রার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ে ব্যবহৃত হইত কিনা বুঝা যায় না। প্রাপ্ত মুদ্রা মধ্যে এক রত্নমাণিক্যের সময়েই দশ প্রকারের মুদ্রা দেখা যায়। এই দশ প্রকারের মধ্যেও আবার কোনটাতে সিংহের মুখ বামদিকে। কোনটাতে ডানদিকে। মহারাজা ধন্যমাণিক্যই উদয়পুরে ১৪২৩ শকাব্দ ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির ও মহাদেবের মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রা দেখিলে অনুমান করা হয়, ১৪১২ শকাব্দ তিনি সিংহাসনস্থ হন।"

শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় রত্ন মাণিক্যের তিনটি তাবিখবিহীন মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ করেন। (৩) কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণের রাজমালা পাঠে জানা যায় রত্নমাণিক্যের ২০টি মুদ্রাব মধ্যে ১২৮৬, ১২৮৮ ও ১২৮৯ শকাব্দের মুদ্রা আছে। রত্নমাণিক্যেব ও ধন্যমাণিক্যের মধ্যবর্ত্তী পাচঁজন বাজার কোন মুদ্রা এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ধন্যমানিক্য ১৩৮৫ শক থেকে ১৪৩৭ শক পর্য্যন্ত মোট ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। তার সময়ের একুশটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৪১২ শকাব্দের (১৪৯০ খৃঃ) ১৭টি, ১৪১৯ শকাব্দের (১৪৯৭ খৃঃ) একটি, ১৪২৮ শকাব্দের (১৫০৬খৃঃ) একটি এবং দুইটি অব্দবিহীন। পরবর্ত্তীকালে ১৪৩৫ শকাব্দে " চাটিগ্রাম বিজয়ের" "স্মারক মুদ্রা" পাওয়া গেছে। একমাত্র তারিখবিহীন মুদ্রা ব্যতীত ধন্যমাণিক্যের আর প্রতিটি মুদ্রাতেই তাঁর মহিষী কমলাদেবীর নাম আছে। কিন্তু কলিকাতাস্থ নমুনাস্বরূপ কিছু ত্রিপুরার মুদ্রা পাঠান হয়। এবং উদয়পুরে আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলি দেখা যায় ধন্যমাণিক্যর অধিকাংশ মুদ্রার মধ্যেই কমলাদেবীর নাম নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় এক পৃষ্ঠা "শ্রীশ্রী ধন্যমাণিক্যে দেব" অপর পৃষ্ঠে পাঁচটি সিংহ। তাহার নীচে শিবলিঙ্গাকৃতি চিহ্ন।

ধন্যমাণিকের পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দেবমাণিক্যের মুদ্রা পাওয়া গেছে। দেবমাণিক্যের মুদ্রায় তাঁর রাণী পদ্মাবতীর নামও উৎকীর্ণ আছে। দেবমাণিক্যের পর তার কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়মাণিক্যের ১৪৫১ শকের মুদ্রা পাওয়া যায়। এতে লেখা আছে " শ্রীশ্রীবিজয় মাণিক্য শ্রীশ্রীলক্ষ্মী মহাদেব্যা।" বিজয়মাণিক্য ১৪৫০ শকে (১৫২৮খৃঃ) সিংহাসনে আরোহন করেন বিজয়মাণিক্যের অভিষেকের মুদ্রা পাওয়া যায়নি। কিন্তু তিনি সুবর্ণগ্রাম (ধ্বজঘাট) জয় করে ব্রহ্মপুত্র, লাক্ষ্যা ও পদ্মা নদীতে স্নান করেন। এবং পরে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা তৈরী করেন। ১৪৭৬ শকে (১৫৫৪খৃঃ) তৈরী মুদ্রার উৎকীর্ণ আছে "ধ্বজঘাটজয়ি শ্রীশ্রীবিজয় মাণিক্য দেব- শ্রীসরস্বতী মহাদেব্যৌ" এবং ১৪(৮)২ শকাব্দের তারিখসহ অন্য মুদ্রাটিতে আছে।

" লাক্ষাস্নায়ি শ্রীশ্রী ত্রিপুরমহেশ বিজয়মাণিক্য দেব শ্রীলক্ষ্মীবালা দেব্যৌঃ"। এই মুদ্রাটির অপর পিঠে বিচিত্র অর্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। বিজয় মাণিক্যের এক প্রকার মুদ্রায় দশভুজা দুর্গা ও চতুর্ভুজ শিবের অর্ধাংশ দিয়ে

তৈরী এক বিচিত্র অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এই অভূতপূর্ব মূর্তিটির পাচঁটি হাত দুর্গার অংশজাত সিংহেব উপর ও দুইটি হাত শিবের অংশজাত বৃষের উপব। ১৪৭৯ শকাব্দে (১৫৫৭খৃঃ) মুদ্রিত বিজয়মাণিক্যের অপর একটি মুদ্রার লিপিতে আছে " প্রতি সিন্ধুম শ্রীশ্রী বিজয় মাণিক্য দেব লক্ষ্মী বালা দেব্যৌ।" বিজয় মাণিক্য তাহার মহিষী লক্ষ্মীদেবীকে কোন এক সময় গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে হীরাপুরে নির্বাসনে দেন। কিছুদিন পর পুনরায় আবার লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করেন। মহাদেবী লক্ষ্মীর নামের সঙ্গে মুদ্রিত বিজয়ের ১৪৫১ শকের, ১৪৭৬ শকের সরস্বতী ও ১৪৭৯ শকের লক্ষ্মীসহ নামের মুদ্রাগুলি উপরি-উল্লিখিত মহিষীকে সমর্থন করে। ১৪৭৬ শকাব্দের পূর্বে লক্ষ্মীকে বনবাস দিয়ে সরস্বতীবে প্রধান মহিষী করেন এবং ১৪৭৯ শকের পূর্বে কোন এক সময় লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন। বিজয়মাণিক্যের পুত্র অনন্তমাণিক্যের ১৪৮৭ শকের মুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রায় অনন্ত মাণিক্যের মুদ্রার উল্লেখ নাই। মহম্মদ রেজাধর রহিম সাহেব এই মুদ্রার কথা উল্লেখ করেন তিনি তাঁর প্রবন্ধে।

অনন্তমাণিক্যকে তার শ্বশুর গোপীপ্রসাদ হত্যা করে ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহন করে। গোপীপ্রসাদ উদয় মাণিক্য নাম গ্রহণ করে পত্নী হীরার সহিত ১৪৮৯ শকাব্দ (১৫৬৭খৃঃ) মুদ্রা নির্ম্মাণ করেন। সেই মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

উদয়মাণিক্যের পর তাঁর পুত্র জয়মাণিক্য রাজা হন। জয়মাণিক্যের সিংহাসনের আরোহন তারিখ মতে জয়মাণিক্য ১০০৬ - ১০০৭ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৬ -১৫৯৭ খৃঃ) রাজ্যত্ব করেন। কমিং সাহেব এবং সেগুম্ সাহেব কৈলাস সিংহের মতই পোষণ করেন। পাদ্রী লঙ সাহেব এ সম্পর্কে কিছু বলেন নি। " ত্রিপুর বংশাবলী " বলেন জয়মাণিক্য ১০০৪ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৪খৃঃ) রাজা হয়ে ছিলেন। পন্ডিত কালী প্রসন্ন বিদ্যাভূষণ অমর মাণিক্যের শাসন কালের ১৪৯৯ শক ও ১৫০২ শকের দু'টির মুদ্রার দ্বারা জয়মাণিক্যের শাসনকাল ১৮৭৬ - ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ বলে তাঁর অনুমান উল্লেখ করেছেন। তিনি উজীর বাড়ীর গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত সে সময়কার রাজাদের রাজত্বকালের এক তালিকার উল্লেখ করে বলেন তালিকা অনুযায়ী জয়মাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৯৭ শক হইতে ১৪৯৮ শক পর্য্যন্ত দেড় বৎসর রাজত্ব করে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ১৪৯৫ শকের জয়মাণিক্যের যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তা দেখে আমরা বলতে পারি উপরোক্ত কারো মতই অভ্রান্ত নয়। জয় মাণিক্যকে হত্যা করে অমর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুদ্রা তৈবী করেন। নিজের এবং তাঁর মহিষী অমরাবতীর নামের ১৪৯৯ শকের এবং সাধারণ ও ১৫০৩ শকের শ্রীহট্টের বিজয়ের " স্মারক মুদ্রা " আবিষ্কৃত হয়েছে। অমরমাণিক্যেব শাসন কাল নিয়েও মতান্তব আছে। কৈলাস সিংহ মহাশয় ১০০৭ ত্রিপুরাব্দে অমর মাণিক্যের সিংহাসনে আরোহন কাল নিৰ্দ্ধারিণ করেন।

মিঃ সেন্ডিস্ সাহেব কৈলাস সিংহ মহাশয়ের সাথে একমত হন। চাক্‌লা- রোসনাবাদের সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ কমিং সাহেবও উপরোক্ত মত পোষণ করেন। রেভারেন্ড জোম্‌স লঙ্ এ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। কালী প্রসন্ন বিদ্যা ভূষণ রাজমালায় বলেছেন মহারাজ অমর মাণিক্যের অমরসাগর খনন কালে শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরপের শাসনকর্ত্তা কুলি প্রদান না করায় অমরমাণিক্য শ্রীহট্ট আক্রমণ করেন এবং জয় করেন। শ্রীহট্ট জয়ের স্মৃতি স্বরূপ অমর মাণিক্য যে মুদ্রা তৈরী করেন তাতে উৎকীর্ণ আছে " শ্রীহট্ট বিজয়ী শ্রীশ্রী অমর মাণিক্য দেব শ্রীঅমরাবতী দেব্যৌ।" এ মুদ্রাই অমর মাণিক্যের রাজত্ব কালের প্রথম মুদ্রা। এই মুদ্রা প্রমাণ করে ১৪৯৯ শকে অমব মাণিক্যের রাজ্যাভিষেক হয়। অমর মাণিক্যের আবিষ্কৃত ১৪৯৯ ও ১৫০৩ শকের মুদ্রার মধ্যে শেষোক্ত মুদ্রা শ্রীহট্ট জয়ের নির্ধারিক। তাঁর শাসন কালেব কোন

মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু তার পরবর্ত্তী রাজধরমাণিক্যের রৌপ্য মুদ্রা ১৫০৮ শকে তৈরী হয়। সে সময় তাঁর মহিষীর সত্যবতীর নাম আছে। এ মুদ্রাই রাজধর মাণিক্যের রাজত্ব কালের প্রথম মুদ্রা।

যশোধর মাণিক্যের প্রচারিত মুদ্রায় ১৫২২ শকের উল্লেখ আছে। মুদ্রায় আছে, সিংহমূর্ত্তি উপরে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি তাহার দুই পার্শ্বে দুটি মূর্ত্তি। শক ১৫২২। শ্রীশ্রীযুত যশোধা মাণিক্যের শ্রীগৌরীলক্ষ্মী মহাদেবী। কিন্তু রাজমালার সঙ্গে এই মুদ্রার লিখিত কথার সাদৃশ্য নেই। রাজমালায় আছে

" পনরশ তেরশক হইল যখন
রাজধর রাজ পুত হইল তখন
তান পুত্র যশোধর হইলেক রাজা
পাত্র মিত্র যশ করে সৈন্য প্রজা "
(যশোধর মাণিক্য খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠা)

তারপর পুনরায় আবার লিখিত হয়,

"পনরশ চব্বিশ শকে যশ রাজা হৈল
যেন মত নাথ রাজ্য যেই মত হৈল।"
(যশো ঃ — ৫৯ পৃষ্ঠা)

রাজমালায় এ'দুটি সময়েরর মধ্যে ১১ বৎসরের প্রভেদ দেখা যায়। মুদ্রার সময়ের সঙ্গে দশ বৎসর পূর্ব্বেও দুই বৎসর পরে মহারাজের রাজ্যলাভের সময় বলা হয়েছে। প্রাচীন বাজমালায় যশোধর খন্ডে আছে —

"পনরশ চব্বিশ শকেতে রাজা হৈল
নানা সুখ ভোগ রাজ্য অশেষ করিল।"

কৈলাসচন্দ্র সিংহ, কমিং সাহেব ও মিঃ সেন্ডিস সাহেব প্রভৃতি মহাশয়গণ ১৬১৩ খৃষ্টাব্দ হতে ১৬২৩ খৃঃ পর্যন্ত যশোধর মাণিকের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করেছেন। রাজমালা বা মুদ্রার সঙ্গে তাঁদের কালের মিল নেই। মতভেদের মীমাংসার একমাত্র অকাট্য প্রমাণ মুদ্রার প্রমাণ। মুদ্রায় রাজার সঙ্গে মহারাণী গৌরলক্ষ্মীর নাম আছে। একাধিক মহিষীর নাম মুদ্রায় ব্যবহার করবার রীতি রাজ্যে আছে পূর্ব্বে তা বলা হয়েছে। সুতরাং দু'প্রকারের মুদ্রা একই সময়ে করার কোন বাধা ছিলনা। যশোধর মাণিক্যের আব একটি মুদ্রায় আছে সিংহ মূর্ত্তির উপরে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, তার দু'পার্শ্বে দুটি মূর্ত্তি। শকঃ ১৫২২। " শ্রীশ্রী যশোমাণিক্য দেব শ্রীলক্ষ্মীগৌরী জয়া মহাদেবীঃ। তাতে বুঝা যায় গৌরলক্ষ্মী ও জয়াবতী নামে দু'জন মহিষী ছিল। ডাঃ অমরনাথ লাহিড়ীর প্রবন্ধে আছে — "যশোধর মাণিক্যের মুদ্রার গৌণদিকে ত্রিপুরা সিংহের উপর নারীযুগল পরিবেষ্টিত কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে। যশোধর মাণিক্যের মুদ্রায় লক্ষ্মী ও জয়া দুই মহিষী ছিলেন এবং তাঁহার উভয়েই অভিষেককালে সম মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। (রাজমালা, তৃতীয় লহর - - ১৫৬ ও ২৩৫-৩৭ পৃঃ)। যদি ইহা ঠিক হয় তবে যশোমাণিক্যের মুদ্রায় পূর্ব্ববর্ণিত "নারী যুগল পরিবেষ্টিত

কৃষ্ণমূর্ত্তির চিত্রণ বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ।"

যশোধর মাণিক্যেব অভিপ্রায়ে কল্যাণ মাণিক্য রাজা হন। ১৫৪৮ শক নির্মিত কল্যাণ মাণিক্যের মুদ্রায় দেখা যায় মুদ্রার প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে কোন নারীর নাম সংযোজিত নেই। কল্যাণ মাণিক্যের মুদ্রায় সিংহের উপরিভাগে একটি শিব লিঙ্গের ছবি। অপর রাজার মুদ্রায় সিংহেব উপরিভাগে ত্রিশূলচিহ্নও আছে। তাঁর শৈবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধারই নিদর্শন। ত্রিপুরার রাজারা এককালে যে শৈব ছিল তারও প্রমাণ এ চিহ্নদ্বাবা প্রমাণিত করে। কল্যাণমাণিক্যেরপুত্র গোবিন্দমাণিক্যের ১৫৮১(১৫৮৯) শকের এক চতুর্থাংশ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। গোবিন্দমাণিক্য তাঁর ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য কর্ত্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। ছত্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ছত্র মাণিক্যের ১৫৮২ শকেব মুদ্রা পাওয়া গেছে । ছত্র মাণিক্যের রৌপ্যমুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠায় — " শ্রীশ্রী হরগৌরী পদে মহারাজ শ্রীশ্রীযুত ছত্র মাণিক্য দেব" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একটি সিংহ ও তাহার নিম্নভাগে " শকাব্দ ১৫৮২" ক্ষোদিত রয়েছে। ১৬০৭ শক নামাঙ্কিত দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের মুদ্রাও পাওয়া গেছে — দ্বিতীয় ধর্ম্ম মাণিক্যের ১৬৩৬ শকের মুদ্রাও পাওয়া গেছে। ১৫ দ্বিতীয় ইন্দ্র মাণিক্যের ১৬৬৬ শকের মুদ্রিত একটি এক চতুর্থাংশ টাকা ঢাকা মিউজিয়ামে আছে । ১৬

ত্রিপুরার মুদ্রা

মুখ্য দিক	গৌণ দিক
১। প্রথম রত্ন মাণিক্য	
লেখনঃ পার্ব্বতীপ/	শ্রীলক্ষ্মী/মহাদেবী/
রামেশ্বরশ্চ/রণপর্বের১২৮৯ শ্রীশ্রীরত্ন মাণিক্য।	
২। প্রথম রত্ন মাণিক্যঃ--	ত্রিপুরা সিংহ
লেখন-"শ্রীশ্রী রত্ন মাণিক্য দেব"	শ্রীদুর্গারাধানাথ
	বিজয়ঃ রত্নপুরে শক - ১২৮৬
৩। প্রথম রত্ন মাণিক্য ঃ-	
একপৃষ্ঠে শ্রীনারায়ণ চরণ পর	শ্রীদুর্গারাধনাথবিজয়ঃ রত্নপুরে
শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্য দেব	
৪। প্রথম রত্ন মাণিক্য ঃ	নারায়ণ চরণ পর
অষ্টভুজ ক্ষেত্রেরমধ্যে শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্য দেব	
৫। প্রথম রত্ন মাণিক্য ঃ-	সিংহের নীচে
শ্রী নারায়ণ চরণ পর	অগ্রভাগে" শ্রী" মধ্যভাগে
শ্রীরত্নমাণিক্য দেব	"দু"পশ্চাৎ ভাগে "গ"
৬। প্রথম রত্নমাণিক্য ঃ -	

শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্য দেব	ত্রিপুরা সিংহ দুর্গা।
৭। ধন্যমাণিক্য ঃ—	
লেখন ঃ— ত্রিপুরেন্দ্র/	ত্রিপুরা সিংহ
শ্রীশ্রী ধন্যমাণিক্য- শ্রীকমলা দেবৌ ।	শকাব্দই
৮। ধন্যমাণিক্য ঃ—	
"চাটিগ্রাম (বি)	ত্রিপুবা সিংহ
জয়ি শ্রীশ্রী ধন্যমাণিক্য / শ্রীকমলা দেব্যৌ	শক । ১৪৩৫
৯। ধন্যমাণিক্য ঃ-	
শ্রীশ্রীধন্যমাণিক্য দেব	ত্রিপুরা সিংহ
শ্রীশ্রীরাম রাম চরণ পরায়ণ	শক। ১৪১২
১০। ধন্যমাণিক্য ঃ-	ত্রিপুরা সিংহ (সিংহের উপর নীচে
"শ্রীশ্রীধন্যমাণিক্য দেব"	পেছনে ছয়টি বিন্দু)
১১। ধন্যমাণিক্য ঃ-	
"শ্রীশ্রীধন্যমাণিক্য দেব"	ত্রিপুরা সিংহ (শিবলিঙ্গাকৃতি চিহ্ন)
১২। ধন্যমাণিক্য ঃ-	
চতুষ্কোণ ক্ষেত্রমধ্যে	ত্রিপুরা সিংহ
"শ্রীশ্রীধন্যমাণিক্য দেব"	
১৩। ধন্যমাণিক্য ঃ-	
"বিজয়ীন্দ্র শ্রীশ্রীধন্যমাণিক্য / কমলা দেব্যৌ	ত্রিপুবা সিংহ
১৪। শ্রীশ্রী বিজয়মাণিক্যঃ- " ধ্বজঘট (জ)/য়ি	"শক ১৪৭২
শ্রীশ্রী বিজয়মাণিক্য দে/ব শ্রীসরস্ব- /তী মহাদেব্যৌ।"	
১৫। প্রথম বিজয়মাণিক্য ঃ- প্রতিসিন্ধু সি/ম	ত্রিপুরা সিংহ
শ্রীশ্রী বিজয়/ মাণিক্য দেব লক্ষ্মী রাণী দেব্যৌ।"	" শক ১৪৬২
১৬। প্রথম বিজয়মাণিক্যঃ-	বৃষবাহন চতুর্ভূজ
লক্ষ্মান্নায়ী শ্রীশ্রী ত্রিপুরম	শিব ও সিংহ বাহিনী
হেম বিজয়ী- মাণিক্য দেব	দশ দুর্গার অর্ধনারী মূর্তি
লক্ষ্মী রাণী দেব্যৌ	
১৭। অনন্তমাণিক্য	ত্রিপুরা সিংহ

"শ্রীশ্রী যুতানা/স্ত	" শক ১৪৮৯"
মাণিক্য দেব শ্রীরত্না বতী মহাদেব্যৌ"	
১৮। উদয়মাণিক্য	ত্রিপুরা সিংহ
"শ্রীশ্রীযুতোদয়	"শক ১৪৮৯
মাণিক্য দেব শ্রীহিবা মহাদেব্যৌ।"	
১৯। অমর মাণিক্যঃ-	
শ্রীহট্ট বিজয়ী / শ্রী	
শ্রীযুতামর মাণিক্য দেব	ত্রিপুরা সিংহ
অমরাবতী দেব্যৌ।"	"শক ১৫০৩ "
২০। জয় মাণিক্য —	
শ্রীশ্রীযুত -জয় মাণিক্য	ত্রিপুবা সিংহ
দেবঃ	" শক ১৪৯৫"
২১। রাজধর মাণিক্যঃ--	
শ্রীশ্রীযুত রাজধর মাণিক্য	
দেবশ্রী	ত্রিপুবা সিংহ
সত্যবতী মহাদেব্যৌ	" শক ১৫০৮ "
২২। যশো মাণিক্য ঃ--	
"শ্রীশ্রী যুত মাণিক্য	ত্রিপুরা সিংহ উপরে
মাণিক্য দেবলক্ষ্মী গৌরী	নারী যুগল পরিবৃত
জয় মহাদেব্যৌঃ "শক ১৫২২"	বংশীধারী কৃষ্ণ মূর্ত্তি
২৩। নর নারয়ণ ঃ—	শ্রীশ্রী মন্নর নারায়ণ
শ্রীশ্রী শিবচরণ কমলমধু /করস্য	ভূপালস্য শাকে ১৪৭৭"
২৪। লক্ষ্মীনারায়ণঃ—	
"শ্রীশ্রী শিবচরণ/	শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণস্য
কমল মধু /করস্য	শাকে ২৫০৯
২৫। প্রাণনারায়ণ —	
"শ্রীশ্রী শিবচরণ	শ্রীশ্রী প্রাণনারায়ণ
কমলমধু/ করস্য"	শাকে/১৫৫৭(?)"

২৬। প্রাণনারায়ণ -- (অর্ধমুদ্রা)

"শ্রীশ্রী শিবচরণ (ন)

কমল নাথ (ধু) করস্য

শ্রীশ্রী ম(ৎ) প্রাণ

নারায়ণ (য়) (ন)

মূদ্রার সাহয্যে ত্রিপুরার রাজগণের যে রাজ্যকাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় তাহার তালিকা।

রাজার নাম	মুদ্রার নাম	খ্রীষ্টাব্দ
১ ।প্রথম রত্নমাণিক্য	১২৮৬-৯	১৩৬৪-৭
২ ।ধন্যমাণিক্য	১৪১২-৩৬	১৪৯০-১৫১৪
৩। দেব মাণিক্য	১৪৪৮	১৫২৬-
৪। বিজয়মাণিক্য	১৪৫১-৮২	১৫২৯-৬০
৫। অনন্ত মাণিক্য	১৪৮৭	১৫৬৫
৬। উদয়মাণিক্য	১৪৮৯	১৫৭৭-৮১
৭। অমর মাণিক্য	১৪৯৯ -	১৫৭৭-৮১
৮। রাজধর মাণিক্য	১৫০৮	১৫৮৬
৯। যশোধর মাণিক্য	১৫২২	১৬০০
১০। কল্যাণ মাণিক্য	১৫৪৮	১৬২৬
১১। গোবিন্দ মাণিক্য	১৫৮১	১৬৫৯
১২। গোবিন্দ মাণিক্য	১৬০২	
১৩। ছত্র মাণিক্য	১৫৮২-৭	
১৪। দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য	১৬০৭	
১৫। দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্য	১৬৩৬	

ত্রিপুরার মুদ্রাগুলি প্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে বিশেষ মূল্যবান ।এ ব্যতীত রাজমালায় বর্ণিত কতকগুলি বিশেষ ঘটনার কথা ত্রিপুর রাজদের "স্মারকমুদ্রা" আবিষ্কারের ফলে সমর্থিত হয়েছে। কাছাড়রাজ ইন্দ্রপ্রতাপ নারায়ণের "১৫২৪" শকে মুদ্রিত শ্রীহট্ট বিজয়ের" এবং সুলতান হুসেন সাহের "কামরূপ, কামতা, রাজনগর ও ওড়িয়া জয়ের বিখ্যাত স্মারক মুদ্রাগুলি ছাড়া ত্রিপুরা রাজদের মত স্মারক মুদ্রা প্রচারের আর বিশেষ সমসাময়িক নজির নেই। এই মুদ্রাগুলি রাজাদের কালনির্ণয়ে সাহায্য করে ।(বাংলা দেশের ইতিহাস--রমেশচন্দ্র মজুমদার)।

মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে লিখিত মহিম কর্ণেলের একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে দিলাম।

"প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে "শ্রীহট্ট বিজয়ী অমর মাণিক্য যাহার নামের "জরফ" (coin নেই) এখনও অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। Indian museum coines catalogue C.P.P 2473) সেই জরফের চিত্র আছে। Asiatic Society তে গেলে আসল জরফ দেখিতে পাওয়া যায়। coronation commemorative coin এ অতি আদরের সহিত রক্ষিত হয়েছে। ইহাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রচলিত coin যত্র তত্র স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। রামগঙ্গা মাণিক্য জরফ ব্যতীত আর জরফ আর ইহার মধ্যে নাই দেখিলাম।

আমাদের দেশের যাহারা বাঙ্গালী সমাজে আদান-প্রদান করিয়াছে তাহাদের ঘরেতে যে "লক্ষ্মীর খইলতা" আছে, তাহাদের সেই খইলতা অনুসন্ধান করিলে "জরফ" নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। রামগঙ্গা মাণিক্যের রাণী চন্দ্রতারা দেবী ছিলেন শ্রীহট্ট দেশের ভদ্রঘরের কন্যা। তাঁহারই সঙ্গে দুইটি স্বজাতীয় কন্যা। আসিয়াছিলেন। আমার পিতামহী সরস্বতীর কন্যা। আমার পিতামহী সরস্বতী দেবী, লক্ষ্মী দেবীর পূজা করিতেন। সেই পূজার জন্য অভয়নগরের তালুক তাহাকে নিষ্কর মিলাহ্ চন্দ্রতারা দেবী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং তাঁহারই লক্ষ্মীর খইলতার মধ্যে দেখিয়াছিলেন শ্রীহট্ট বিজয়ী অমর মাণিক্যের একটা রূপার জরফ। আমাদের একটা Tripurah Museum হইয়াছিল। Tripurah State Museum করিতেছে। এত প্রাচীন রাজবংশ ত্রিপুরায় রাজত্ব করিতেছে। তাঁহাদের 'জরফ' ত্রিপুরায় থাকিবে না। Dr.Wise ছিলেন কাশীচন্দ্র মাণিক্যের আমলের কর্ম্মচারী। এই Wise সাহেব রাজমালা গ্রন্থ 1850তে Asiatic Societyর নিকট দিয়াছিলেন। তখন ইহা Rv. Mr.Long সাহেব সমালোচনা করেন। লঙ সাহেবের সমালোচনা অদ্য পর্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই সময় তিনি The Last Hindo Kingdom of Sylhet নামে একটি লেখা Society -র Journal - এ 1850 - তে প্রকাশ করেন। Travernir নিজ গ্রন্থে ছত্র মাণিক্যের 'জরফ' উৎকীর্ণ করিয়াছেন। কৈলাস সিংহ নিজ রাজমালা গ্রন্থে ধর্ম্মমাণিক্যের ও অন্যান্য রাজার জরফের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। Tipperah State museum - এ গোবিন্দ মাণিক্যের প্রস্তরলিপি রক্ষিত হইয়াছিল।"

মুদ্রা সম্পর্কে ঠাকুর মহিম কর্ণেলের চিন্তাধারা কত দরদপূর্ণ ছিল এ পত্র তার প্রমাণ। পত্রে 'জরফের' কথা আছে। এবং এ চিঠিতে জানা যায় Tripurah State Museum ছিল। সম্প্রতি ত্রিপুরা প্রশাসন কর্ত্তৃক যদি চেষ্টা করেন তবে ত্রিপুরার বহু মুদ্রা এখনও আবিষ্কৃত করা যাবে। ত্রিপুরার মুদ্রার মধ্যে নিহিত আছে ত্রিপুরার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার বৈজ্ঞানিক উপাদান। সেদিন থেকে ত্রিপুরার সরকারী বেসরকারী প্রতিটি সংস্থা এবং অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণ এগিয়ে আসবেন ত্রিপুরায় প্রাচীন উপাদান সংগ্রহে — বিশেষ করে মুদ্রা সংগ্রহে এ প্রত্যাশা উপেক্ষার নয়।

তথ্যসূত্র ঃ—

১। চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত "অরুণ" পত্রিকা ১৩৫১ ত্রিং ; ১৬ই বৈশাখ সংখ্যা।

২। উদয়পুর বিবরণ —ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত।

৩। An,Rep Arch,Surv,Ind, 1912 --14, p 249f.

৪। ডাঃ অমর নাথ লাহিড়ীর প্রবন্ধ — "কোচবিহার ও ত্রিপুরা।"

৫। ডাঃ অমর নাথ লাহিড়ীর কোচবিহার ও ত্রিপুরা (প্রবন্ধ)।
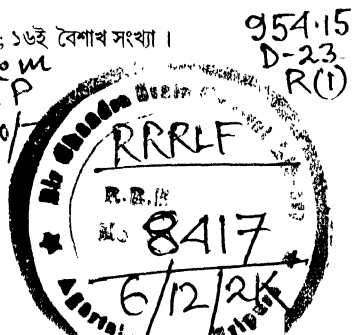
৬। Pakistan Historical Society Journal Vol.IV PP-- 409.

৭। ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্ম্মণের প্রবন্ধ -- আনন্দ বাজার ১৯শে পৌষ ১৩৫৪।

৮। রাজমালা ২য় লহর পৃষ্ঠা- ১৮৩-৮৩ কালীপ্রসন্ন সেন ।

৯। আনন্দ বাজার পত্রিকা ,১৯শে পৌষ ১৩৫৪।

১০। History of Tripura - E.F. Sandays.

১১। ibid. P .48 N Fig --3.

১২। গোবিন্দ মাণিক্যের ১৫০২ শকের উল্লেখ আছে । (V.A.Smith-catalogue of coins in the Indian Museum P -- 297.

১৩। Num Suppl XXXVII P.N.53

১৪। ibid P.N.48 Fig ---4.

১৫। Marsden Numorl P 195 Pl LII Mcc IX

১৬। J.P.H.S. IV.PP 109 .

গ্রন্থপঞ্জী ঃ--

১। কালী প্রসন্ন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত--রাজমালা --১ম,২য, ৩য় লহর।

২। ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্ম্মণ প্রবন্ধ (আনন্দ বাজার পত্রিকা) ১৯শে পৌষ, ১৩২৪বাং।

৩। Mursdin's Numimata arienta the Illustrate p. 793 Plate LII

৪। N.K.Bhattaslli Numismall supplement XAXVII. p.p 47-53

৫। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় --বাঙ্গালীর ইতিহাস ২য় খন্ড ।

৬। কৈলাস চন্দ্র সিংহ --- রাজমালা।

৭। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি --শ্রীহট্টের ইতিহাস ।

৮। উদয়পুর বিবরণ -- ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত।

৯। রমেশ চন্দ্র মজুমদার --বাংলার ইতিহাস ।

১০। "অরুণ" ও " চিনিহা" পত্রিকা ।

১১। Mr . E.F. Sandays --"History of Tripura Mohammadian Period Page" 18.

ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য

ত্রিপুরায় স্মরণাতীত কাল থেকেই বৈষ্ণব ধর্ম চলে এসেছে এবং সেদিনের বৈষ্ণব ধর্মের চলমান ধারা আজও বহমান।

প্রাথমিক দলিলপত্র বা ইতিহাস থেকে আমরা এটুকু জানতে পেরেছি যে, Raja Pandita flourishe ' under Dhanya Manikya king of Tripura who invited expert singers and musicians from Mithila to his kingdom" (Joykanta Misra).

উপরোক্ত কথাগুলো জয়কান্ত মিশ্র তার মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন যার সমর্থন আমরা ত্রিপুরার রাজ ইতিহাস রাজমালায় পেয়ে থাকি। রাজমালায় আছে, ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি/রাজাতে শিখায় গীতনৃত্য নৃপক্ষনি। ত্রিপুর সকলে গীত যেই আসে গায়। ছাগ আন্ততার যন্তে ত্রিপুরে যাগায়।"

নেপালে বিদ্যাপতির পদাবলীর একখানা পুঁথি পাওয়া যায়, পরবতীকালে যে পুঁথিটিকে অবলম্বন করে সুভদ্র ঝা প্যারিসে গিয়ে জুল ব্লথের অধীনে বিদ্যাপতি সম্পর্কে গবেষণা করেন। সেই পুঁথিতে একটি পদের ভণিতায় "ধন্যমানিক্য' নাম আছে। ডঃ সুকুমাব সেন সেই ধন্যমানিক্য ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্য বলে নির্দ্দেশ কবেছেন। সেই পদটি ব্রজবুলিতে লেখা। মহারাজ ধন্যমাণিক্য ১৪৯০ থেকে ১৫২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সে সময় ত্রিপুবা সাহিত্যও শিল্পকলায় সমৃদ্ধ ছিল। ঐ পদটি ছিল মালিনী রাধার ব্যবহারে উদাসীন ভাবাপন্ন কৃষ্ণকে দূতী এসে সাধছে।

এখন প্রশ্ন হল যদিও ভাবের দিক থেকে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন এবং রচয়িতা হিসাবে ধন্য মাণিক্যের নাম পাওয়া যায়, তা সত্বেও ধন্যমাণিক্য ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন শৈব। তাই বলতে হয়, বৈষ্ণবধর্ম যে আবহমান কাল থেকে অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে ত্রিপুরায় প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরবর্তীকালে রাজমালা পাঠে আমরা জানতে পারি মহারাজ রাজধর মাণিক্য ত্রিপুরা নৃপতিদের মধ্যে প্রথম বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি সার্বভৌম ও বিরিঞ্চি নারায়ণ নামে পরম বৈষ্ণব পুরোহিত ও ২০০ জন ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণবের সঙ্গে সর্বদা ভাগবত ও অনান্য যাবতীয় গ্রন্থ পাঠ করতেন। এই রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকাল ছিল ১৬১১ খৃষ্টাব্দ এবং তিনি ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথম রাজধর মাণিক্য।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্য বসেন। তিনি মণিপুর রাজ রাজসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। মণিপুর রাজবংশের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজবংশের এটাই প্রথম সম্বন্ধ এবং এই বিবাহের মাধ্যমে মণিপুরের বৈষ্ণবধর্ম ত্রিপুরায় রাজধর্ম হিসাবে প্রাধান্য পায়। রাজধর মাণিক্য নিজে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন, তিনি অষ্টধাতু দ্বারা 'বৃন্দাবনচন্ড' নামে দেবমূর্তি নির্মাণ করেন।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলেই ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের মতে বীরচন্দ্র মাণিক্যকে যথার্থ বাংলার শেষ বৈষ্ণব কবি বলে আখায়িত করা যায়। তিনি নিজেও বহু বৈষ্ণবপদ রচনা করেছিলেন -- এবং তার সময়ে বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্ম্মের যে প্রসারতা লাভ করেছিল সে কথাও সবার জানা। ধন্যমাণিক্যের সময় যে বৈষ্ণব পদাবলী মৈথিলি ভাষায় রচিত হয়েছিল তাই বীরচন্দ্রের আমলে বাংলা ভাষায় রচিত হয়ে উভয় কালের মধ্যে সেতু রচনা করেছিল।

বীরচন্দ্রের আমলেই বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ এখানে অনুদিত ও রচিত হয়। ১২৮৭ বাংলা সনে (১৮৮০ ইং) 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় পন্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এক বিজ্ঞাপন বের হয়। বিজ্ঞাপনে 'শ্রীমদ্ভাগবত' 'ভাগবত তত্ব বৌধিকা' এবং 'উজ্জ্বল নীলমণি' প্রভৃতি প্রকাশের বিষয় ছিল। সেই বিজ্ঞাপনে বীরচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে, তিনি ঐ সকল পুস্তক সংগৃহীত করেন এবং পাঠ করেন। এবং আনন্দের সহিত মহারাজ বীরচন্দ্র পন্ডিত মহাশয়কে ২০০ টাকা প্রদান করেন। এতে উৎসাহিত হয়ে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় 'ললিত মাধব নাটক' 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বের করলেন এবং মহারাজা বীরচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করলেন। মহারাজা তৎক্ষণাৎ আরও ৩০০ টাকা পন্ডিতবরকে দান করেন। তারপর মহারাজা পন্ডিত রামনারায়ণকে ত্রিপুরার রাজসভায় আসবার আমন্ত্রণ জানালেন।

পন্ডিত রামনারায়ণ ছিলেন 'বহরমপুরের সুপন্ডিত বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রাদি সংকলক ও প্রকাশক। কৌলিক মিশ্র উপাধিধারী সুপন্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। বহরমপুরের ঁরাধারমণ ঠাকুরবাড়ির, রাধারমণ মুদ্রাযন্ত্র, হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা ইত্যাদি বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা।

১২৯০ বাংলা সনে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ত্রিপুরার দরবারে উপস্থিত হলেন যা তাঁর নিজের উক্তিতেই জানা যাছে।

"তৎকালীন আমাব মনোমধ্যে এইরূপ অভিলাষ উপস্থিত হইয়াছিল, আমি ব্রাহ্মণজাত কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভও করিয়াছি, যেখানে যাইব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবই পারিব। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে গোস্বামী পাদদিগের টীকা সফল সন্নিবেশ পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কন করিয়া যদি সাধারণ লোককে ভাগবত রূপ অমৃতফল আস্বাদন করাইতে পারি তাহা হইলেই এ সার্থক হইবে। ধনাঢ্যলোক অর্থব্যয়ে পন্ডিত দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে পারেন কিন্তু সাধারণের কি উপায়? আমাব অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই, আমি নিজের জন্য কিছুই চাহি না। সাধারণ লোকের জন্যই আমি চেষ্টা করিব। শ্রীশ্রীহারাজের প্রতি শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্য দেব" অনুকূল হইয়া তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করাইলেন। ১২৯০ সালের ২৭ শ্রাবণ শ্রীশ্রীহারাজ এক হাজার শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমতি প্রদান করিলেন। ৩রা ভাদ্র রাজধানী হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলাম। ১২৯০ সালেব ৬ই পৌষ হইতে শ্রীমদ্ভগবতের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইল। কার্য্য উত্তম রূপে চলিতেছিল, গ্রাহকগণের আগ্রহ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৩০ খন্ড মুদ্রাঙ্কনের পর আমি সকলের অনুরোধে শ্রীমম্মহারাজকে নিবেদন করিলে মহারাজ আরও এক সহস্র মুদ্রাঙ্কনের অনুমতি করেন। সেই অবধি মহারাজের প্রসন্নতায় দুই সহস্র লোক গ্রাহক ভাগবত ফল আস্বাদন করিতে থাকিলেন। ১৩০২ সালের ১৫ই পৌষ ভাগবত মুদ্রাঙ্কন কার্য্য দ্বাদশ বৎসর শেষ হইল।"

এই বৈষ্ণব চূড়ামণি রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকে কেন্দ্র করে সেদিন ত্রিপুরায় হরিভক্তি প্রদাযিনী সভার সৃষ্টি হয়। এবার হরিভক্তি সভার ইতিহাসের কথায় আসা যাক।

সে সময় ত্রিপুরা রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাজ সরকার ও বাহিরে প্রায়ই বৈষ্ণব ভক্তদের সম্মেলন হত। এ তথ্য আমরা জানতে পারি সে সময়কার স্মৃতিসম্বলিত কিছু গ্রন্থের মধ্যে। ত্রিপুরার রাজার অর্থে বহরমপুরে মুদ্রা যন্ত্রটি সম্প্রসারিত করেন। স্ত্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ স্কন্ধের পর স্কন্ধ প্রকাশ করেন। অপর দিকে শ্রীশ্রীনরহরি চক্রবর্তী প্রণীত 'ভক্তি রত্নাকর' লোচন দাস বিরচিত 'চৈতন্য মঙ্গল' প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে চৈতনাব্দ ৪০২ কার্ত্তিক মাসে রামনারায়ণ

ত্রিপুরেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন পত্রে বলেছেন।— " গত শ্রাবণ মাসে আপনার অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুত রাধারমণ বাবুর বিশেষ চেষ্টায় রাজধানীতে আমা কর্তৃক যে একটি 'হরিভক্তি প্রদায়িনী ' সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সভ্য মহোদয়গণ এই গ্রন্থখানি পর্যালোচনা করুন। তাহাতে তাহাঁদের বিশেষ উপকার দর্শিবে। অর্থাৎ তাহারা ভক্তি রত্নাকরে নিমগ্ন হইয়া সংসার সন্তাপ হইতে পরিমুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত কথাগুলো থেকে অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে বহরমপুরে পূর্ব হতে প্রতিষ্ঠিত হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার' আগরতলা শাখারূপে ৪০২ চৈতন্যাব্দের শ্রাবণ মাসে একটি বৈষ্ণব ধর্ম্মসভা সৃষ্টি লাভ করেছিল । বর্তমানে ৪৯৯ চৈতনাব্দ হিসাবে, আজ হতে ঠিক ৯৮ বৎসর পূর্বে অর্থ্যাৎ বাংলা ১২৯৫ সালের শ্রাবণ মাসে " হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার" আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হওয়ার কথাই প্রমাণ করে ।

এরপর ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্ম প্রসাবের উদ্দেশ্যে রামনাবায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এই হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার মাধ্যমে বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশ করেন । নিম্নে তা দেয়া গেল ।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে রামনারায়ণ 'কৃষ্ণ - কর্ণামৃত' সংস্কৃত নাটকখানি অনুবাদ কবেন। এগ্রন্থটি অতি প্রাচীন । কবি বিল্বমঙ্গল ইহার রচয়িতা । এ বই এদেশে ছিল না । যে সময় মহাপ্রভু চৈতন্য দেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে দক্ষিণ দেশে যান সে সময় তিনি এ বইটি সেখান থেকে আনেন । মহাপ্রভুস্বরূপ ও রামানন্দের সঙ্গে এ বইটি সেখানে থেকে আনেন । মহাপ্রভুস্বরূপ ও রামানন্দের সঙ্গে এ বইটি পাঠ কবে আনন্দ লাভ করতেন । পন্ডিত রামনারায়ণ এ বইটি ও বীরচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেন । উৎর্গপত্রে লিখেছিলেন ঃ— মহারাজ সম্প্রতি কবিবর শ্রীবিল্বমঙ্গল রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ মূলশ্লোক, টীকা, অনুবাদ ও যদুনন্দন ঠাকুরের পয়ার সহ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে পন্ডিত রামনারায়ণ মহাশয় ' কর্ণানন্দ' অনুবাদ করেন । এ বইয়ের মূল রচনাকারী যদুনন্দন দাস । ১৫২৯ শকাব্দের বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার মাগ্ড়ার নিকট ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বুধাইপাড়া গ্রামে শ্রীহেমলতা ঠাকুরানীর পাটে এ পুস্তক শেষ করেন যদুনন্দন দাস । বইটিতে সাতটি পরিচ্ছেদ। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শাখা বর্ণন, মূল শাখা বর্ণন,বীর হাম্বীরের পত্রিকা প্রেরণ, আর্য কবিরাজ ছয় চক্রবর্তীর বিবরণ, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে সন্দেহচ্ছেদন,বইটির বিষয় বস্তু। এই বৈষ্ণব গ্রন্থটিও পন্ডিত মহাশয় বীরচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দে রামনারায়ণ মহাকবি কর্ণপুর প্রণীত বৈষ্ণব গ্রন্থ 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' সংস্কৃত বইটির অনুবাদ করেন । কবি কর্ণপুরের পূর্ব নাম ছিল পুরী দাস । মহাপ্রভু চৈতন্য দেব ' কবি কর্ণপুর' নাম রাখেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণলীলার কি কি রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছে তাই সে বইয়ের বিষয়বস্তু।

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটি কথা বলে নিই যে, বীরচন্দ্র নিজেও বহু বৈষ্ণব কবিতা ও গ্রন্থ লিখেছেন, তিনি বৈষ্ণব ভাবধারায় যে সব গ্রন্থ লিখেছেন তা হল 'হোরী' 'ঝুলন মঙ্গল' পুস্তকদ্বয়।

১২৮৪ বঙ্গাব্দে রাধাকিশোর মাণিক্যের আদেশে অভয়ানন্দ তর্কবাগীশ আগরতলা ' বীরযন্ত্রে গৌবিন্দোদ্বাহ কৌমুদী প্রকাশ করেন ।

১৩১৮ ত্রিপুরাব্দে (১৩১৫ বঙ্গাব্দে) কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত আগরতলা বীরচন্দ্র লাইব্রেরী হতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ চরিত বইটি প্রকাশ করেন । বহু পুস্তক থেকে সংকলন করে নিত্যানন্দের চরিত্র উপাখান

রচিত হয় ।

ত্রিপুরায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও প্রসারে 'শ্রীপাট' এর ভূমিকা ও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই শ্রীপাট হল পরম বৈষ্ণব বিপিনবিহারী গোস্বামী সেবিত শ্রীশ্রী নীলকান্ত মণি নামক শালগ্রাম শিলাকে মহারাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্য প্রতিষ্ঠিত করেন — 'শ্রীপাট' চিহ্নিত ভূমিতে । এর থেকেই শ্রীপাটের নামকরণ ।

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের নিমিত্ত রাজধানীর লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়িতে প্রতি বুধবার ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করেন । ভাগবত পাঠের সঙ্গে সংকীর্ত্তন ব্যবস্থা ও পরিচালনায় সেদিন ছিলেন প্রভু রাধালাল গোস্বামী মহোদয় । রাধালাল গোস্বামীর পর সে ভার ন্যস্ত হয় বিখ্যাত ভাগবত পাঠক যদু পাঁড়ের উপর । এ ছাড়া সেদিন 'শ্রীপাটের অঙ্গনে ভাগবত পাঠ ও সংকীর্তন হত। কীতর্নে সেদিন অংশগ্রহণ করতেন নরোত্তম দাস বাবাজী, রাধাচরণ শীল, নকুল সাধু প্রভৃতিরা।

মহারাজ বীরবিক্রমের রাজত্বকালে শ্রীপাটে অবস্থিত নিতাইদাস গোস্বামীর পরিচালনায় 'ভাগবতধর্ম মন্ডল' প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের ৯ই চৈত্র (১৩৪৬বঙ্গাব্দ) ভাগবত ধর্ম মহামন্ডলের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন সংগঠিত হয় এবং ঐ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ । ১৩৪৬ বাংলা সনের ২৯শে চৈত্র নিখিল ভারত কৃষ্টিগত ঐক্য সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় । সে অনুষ্ঠানে শ্রীপাটের প্রভুপাদ নিতাইদাস গোস্বামী সভাপতি হিসাবে ছিলেন ।

মহারাজ বীরচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারী সুপন্ডিত রাধারমণ ঘোষ এবং বাজসভার দুই গুণীব্যক্তি শশিভূষণ বসু ও মদন মোহন মিত্র এই তিনজনে সম্মিলিত ভাবে একটি গ্রন্থ প্রকাশ কবেন । এইটি ছিল কীর্তনের বই ।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভূষণমোহন প্রভু গোস্বামী 'সনাতন ধর্ম্মসভা' থেকে 'সদাচার শিক্ষা' বইটি প্রকাশ করেন। ১৯৫২ সনে লালবাবু সিংহ প্রকাশ করেন ভক্তি তত্ত্বমালা । ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী উজ্জ্বলা দেবী 'রামলীলা' বইটি প্রকাশ করেন ।

পরিশেষে একথা বলেই প্রবন্ধ শেষ করছি যে আবহমানকাল থেকে ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য চর্চা চলে আসছে যার ধারা এখনও বহমান ।

ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্মের সেকাল একাল

প্রাচীনকাল থেকেই ত্রিপুরার রাজবংশ শৈবধর্মাবলম্বী। প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ কিরাতদের শৈবধর্মাবলম্বী বলে অভিহিত করেন। শৈবধর্মের পর আগমোক্ত ধর্ম্ম ত্রিপুরায় প্রচারিত হয়। কামরূপে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সেখান হতে একদল ব্রাহ্মণ পঞ্চমকারের বীজ নিয়ে ত্রিপুরায় আগমন করেন। চট্টগ্রামের চন্দ্রশেখর এবং ত্রিপুরার ত্রিপুরাসুন্দরী বহুকালের প্রাচীন না হলেও, ত্রিপুরার দেবতামুড়ার পর্ব্বতগাত্রে খোদিত দেবী ভগবতীর দশভূজা মহিষাসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তি যা উৎকীর্ণ ছিল তা — অবশ্যই সুপ্রাচীন বলে স্বীকার করতে হবে। ইলোরা কিংবা ধউলীর পর্বতগাত্রে খোদিত গুহা এবং মূর্ত্তিসমূহের ন্যায় দেবতামুড়ার পর্বত গাত্রে খোদিত দেবমূর্ত্তিসমূহ তত প্রাচীন না হলেও, তাতে প্রাচীন আর্য্যদিগের সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস। এ সকল ভাস্কর্যের সময়কাল দেড় হাজার বৎসরের অধিক বলে মনে হয় না। সুতরাং এর পূর্বে আর্যগণ তান্ত্রিক ধর্ম্মের বীজ নিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। চট্টগ্রামের তাম্রশাসনে এর কিছু প্রমাণ দেখা যায়। এ সময়ের দীর্ঘকাল পর চৈতন্যের শিষ্যগণ তাঁদের ধর্ম্ম নিয়ে ত্রিপুরায় আসেন। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম অধিককাল ত্রিপুরায় আধিপত্য লাভ করতে পারে নি। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ সকলেই শাক্ত। কালী ও দুর্গা পূজা সগৌরবে বিরাজমান। ত্রিপুরার রাজবংশ অল্পকাল যাবৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করলেও শাক্ত ধর্ম্মের প্রভাবমুক্ত কোন দিনই হতে পারেনি। এ রাজ্যে আবহমান কাল থেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আস্‌ছে।

প্রসঙ্গান্তরে একটি কথা বলা প্রয়োজন, ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম্মের কথা বলতে গেলে স্বাভাবতঃ প্রাচীন ত্রিপুরার কথা আস্‌বে। সে সময়কার ত্রিপুরার রাজ্যসীমা অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের আলোচনা করাটাই সঙ্গত বলে মনে হয়। সে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ত্রিপুরার সীমারেখা ও ত্রিপুরার রাজনীতিক ইতিহাস জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে বৌদ্ধযুগের ত্রিপুরার ইতিহাস প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে হুয়েনসাং বাঙ্গালায় আসেন। সে সময় সমতটে তিনি ২০০০ হাজার বৌদ্ধভিক্ষুকে বাস করতে দেখেন। ঐতিহাসিকদের মতে সমতট ও ত্রিপুরা (পার্বত্য ত্রিপুরা সহ) অভিন্ন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তদীয় বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন — "বরাহ মিহিরের (ষষ্ঠ শতক) বৃহৎ সংহিতায় পুন্ড্র তাম্রলিপ্তক বর্ধমান — বঙ্গের সঙ্গে সমতট নামে একটি জনপদের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে। সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণী পাঠে মনে হয় সমতট ছিল কামরূপের দক্ষিণে। এই শতকেরই শেষাশেষি ইৎসিঙ সমতটে রাজভট্ট নামে এক রাজার উল্লেখ করিতেছেন। রাজভট্ট ও আস্রফপুর পাট্টালির (সপ্তম শতক) রাজভট্টের একই ব্যক্তি বলিয়া বহু-দিন পন্ডিতসমাজে স্বীকৃত হইয়াছেন। রাজভট্টের অন্যতম রাজধানী ছিল কর্মান্ত বা ত্রিপুরা জেলার বড়কাম্‌। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের বিবরণী পাঠে মনে হয়, মধ্য বাংলার অন্ততঃ কিয়দংশ এই সমতটের অংশ ছিল। অথচ

বর্ত্তমান ত্রিপুরাও যে সমতটের অংশ ছিল— সপ্তম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত, তাহা অনস্বীকার্য। দশম শতকে প্রথম মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় সম্বৎসরে নির্ম্মিত এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তিলিপি, আনুমানিক একাদশ -দ্বাদশ শতকের একটি চিত্রিত পান্ডুলিপিতে "চতিলা লোকনাথ সমতটে অরিষ্ঠান " উক্তি (চম্লিতলা বর্তমান ত্রিপুরায়) ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দের দামোদর দেবের প্রকাশিত মেহার পাট্টালী ইত্যাদি সাক্ষ্যের ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ত্রিপুরা জেলাই ছিল সমতটের প্রধান কেন্দ্র। এই কেন্দ্রস্থলটি যে একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত পট্টিকেরা রাজ্যের অন্তভুর্ক্ত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পান্ডুলিপিতে (১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে) চুন্ডাদেবীর ছবির নীচে লেখা " পট্টিকোর চুন্ডাবর ভবনে চুন্ডা।" এই চুন্ডাবর ভবন ও চুন্ডাদেবীর ছবির সঙ্গে বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চুন্টা গ্রামের যোগ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। দ্বাদশ শতকে সমতটের পশ্চিম সীমা বোধহয় মধ্য বঙ্গ অতিক্রম করিয়া একেবারে বর্তমান চব্বিশ পরগণার খাড়িম্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"

দ্বিতীয় কিরাত রাজ্যের পর ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিপুররাজ প্রতীত প্রবঙ্গ বা ত্রিপুবায প্রতিষ্ঠিত হন। প্রবঙ্গ বা ত্রিপুরার সম্মিলিত ভূভাগকেই সে সময় সমতট বলে ঐতিহাসিকগণ চিহ্নিত করেন। অধ্যাপক শতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর গ্রন্থে বলেছেন --- " যাহাকে আমরা উপবঙ্গ বলিয়াছি বৌদ্ধ যুগে তাহারই নাম হয় সমতট। ইহা সমুদ্র হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাগীরথী হইতে পূর্বমুখে সমতটে কমলাঙ্ক(কুমিল্লা) ও চট্টল (চট্টগ্রাম) রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা যায়। " (যশোহর খুলনার ইতিহাস --- ১৭৩ পৃঃ) এই উপবঙ্গ সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতায় আছে, ইহা অগ্নিকোণে অবস্থিত। রাজমালায় ত্রিপুরা অগ্নিকোণবর্ত্তী দেশ বলে অভিহিত হয়েছে। সুতরাং সমতট ও ত্রিপুরা উভয়ই সেদিন উপবঙ্গ হিসাবে পরিচিত ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। ঐহিতাহাসিক শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মতানুসারে, হিউয়েনসাঙ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন সমতট রাজ্যে আসেন তখন তিনি কমলাঙ্কের উত্তরে "তালাপতি " নামে স্বতন্ত্র রাজ্য বর্তমান ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এই " তালাপতি" রাজ্যকে ওয়েবেষ্টার তাঁর Tippera District Gazetteer-এ " ত্রিপুরা" বলিয়া অভিহিত করেন।

উপরিলিখিত " কমলাঙ্ক " রাজ্য কখন বর্ত্তমান ছিল, আজ তাহা সঠিকভাবে বলা সুকঠিন। অতি প্রাচীন কালে কলিঙ্গদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার দক্ষিণাংশের যোগাযোগ ছিল, ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে জানা গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বিজয় মজুমদার বলেন -" ভারতবর্ষের পূর্ব্ব বিভাগের কমিলা (কুমিল্লা, চট্টল(চট্টগ্রাম) এবং আরাকান লইয়া দ্রাবিড়দিগের ত্রিকলিঙ্গ রাজ্যের একটি উপরিভাগ সৃষ্ট হয়।" (প্রাচীন সভ্যতা, ৮৪ পৃঃ)। কুমিল্লার নাম সম্বন্ধে পুরাতত্বের সন্ধানে এর মূলনাম " কর্মলিঙ্গ " ছিল বলে প্রত্নতত্ত্ব হতে জানা যায়। (vide Geographical Dictionary at Ancient and Mediaeval India --- By Nandolal Dey) কলিঙ্গদিগের ত্রিকলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী " মুখলিঙ্গ " নামের সঙ্গে লিঙ্গ শব্দের স্পষ্ট যোগ দেখা যায়। " কমলিঙ্গ " নামে কলিঙ্গের নামকরণের সে বিশেষত্ব অনুসৃত হয়েছে বলে

পরিলক্ষিত হয় । সুতরাং " কমলিঙ্গ" নামটি কলিঙ্গদের প্রদত্ত নাম বলে অনুমিত হয়। ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের মতে মুক্তা, বঙ্গ , কামরূপ, কম্বোজ, কাম্‌তা, কমিল্লা প্রভৃতি নামের কাম বা কম শব্দগুলি আর্য্যভাষার পদ নয় । এগুলি হচ্ছে অনার্য জাতির নাম । তাদের নাম থেকে তাদের অধ্যুষিত প্রদেশের নামকরণ হয়েছে ।" (সবুজ পত্র, শ্রাবণ ও আশ্বিন, ১৩৩৩ বাং) তাহলে কলিঙ্গ নামটির কমলিঙ্গ নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ বলে মনে করা যেতে পারে । সুতরাং কুমিল্লা, (বড়) কাম্‌তা প্রথমতঃ কলিঙ্গদের উপনিবেশ ছিল বলে অনুমান করা যায় । পাদ্রী লঙ্ সাহেব বাংলা দেশের সমগ্র পূর্ব ভাগকেই ত্রিপুরার অন্তর্গত বলে অভিহিত করেছেন। ত্রিপুরার রাজমালা পাঠে জানা যায় উত্তরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, দক্ষিণে নোয়াখালি ও পশ্চিমে সোনারগাঁ সমস্তই সেদিন ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পন্ডিত বামন শিবরাম আপ্তে মহোদয় তাঁর সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে বঙ্গ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন -- বঙ্গ" also called সমতট or the Plains) - A name for the Eastern Bengal (to be clearly distinguished from গৌড় or Northern Bengal) including also sea-coast of Bengal It seems to have included at one time Tipperah and the Garo hills" (Practical Sanskrit English Dictionary) । সে হিসাবে বলা যায়, উত্তর-বঙ্গ পূর্ব্বের গৌড় নামে অভিহিত ছিল এবং বঙ্গ নামটি পূর্ব্ববঙ্গেব প্রতি প্রযুক্ত হত । প্রত্নতাত্ত্বিক প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্তে" বঙ্গের অধিষ্ঠান সম্পর্কে লিখেছেন — " বর্ত্তমান বাংলার দক্ষিণাংশ।" সুতরাং ত্রিপুরা পূর্ব্ববঙ্গের আদিস্থান একথা স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেয়া যায় । পূর্ব্ববঙ্গ যে এককালে ত্রিপুরাকেই বুঝাত , কোন কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে সে কথাও জানা যায় । সুতরাং একই কারণে এক সময় অর্দ্ধবঙ্গই ত্রিপুরা নামের দ্বারা শাসিত হত । যেহেতু সেদিন একদিকে যেমন সমতটের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত তেমনি ত্রিপুরার বৌদ্ধ সংস্কৃতির কথা লিখতে গেলে সমতটেরে কথা আস্‌বেই। সমতট আর ত্রিপুবা যে অভিন্ন রাজ্য ও ত্রিপুরা নৃপতি দ্বারা শাসিত, তা উপরোক্ত প্রমাণ যোগে প্রতিষ্ঠিত । সমতট ও ত্রিপুরা বৌদ্ধঅধ্যুষিত অঞ্চল ছিল।

পালযুগে বৌদ্ধধর্ম্ম অধিক প্রসার লাভ করে। অষ্টম শতাব্দী থেকেএকাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পালরাজাদেব বৌদ্ধ প্রীতির অনেক নিদর্শন দেখা যায় । বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের কথাও প্রাক্‌গুপ্ত যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যের অল্প বিস্তর প্রমাণ আছে । তৃতীয় শতকে বাংলা দেশে চীনা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবশালী ছিল তার প্রমাণ চীন পরিব্রাজকদের ইতিহাস থেকে জানা যায় । সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গালী শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য্য পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন । শীলভদ্র সমতটের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার বাংলায়,ত্রিপুরায় ও চট্টগ্রামে অধিক ছিল ।

৫০৬ – ৭ অব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি থেকে জানা যায় কুমিল্লা অঞ্চলে রাজবিহার নামে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল । এ রাজবিহারের সমসাময়িক মহারাজ বৈন্যগুপ্তের ভূমিদান বিষয়ক একখানি তাম্রশাসনে ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর গ্রাম পাওয়া যায় । রুদ্রদত্তের আশ্রম বিহারের নাম সে সময় দৃষ্ট

হয। অথচ বৈন্যগুপ্ত ছিলেন শৈবধর্ম্মী। শৈবধর্মী হয়েও ত্রিপুরার রাজবংশের ন্যায় বৈন্যগুপ্ত বৌদ্ধ বিহারের জন্য ভূমিদান করেছিলেন।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদে ত্রিপুরার নৃপতি প্রতীত প্রবঙ্গ ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। প্রতীতের শাসনকালে কাছাড়ও ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মনু নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী সংস্থাপিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে ত্রিপুরার সিংহাসনে নবরায়ের পুত্র হামতরফা বা যুঝার ফা অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুঝার ফা রাঙ্গামাটি জয় করেন। রাঙ্গামাটি বলতে সে সময় ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের পশ্চিমাংশ বোঝাত। রাঙ্গামাটির আয়তন ত্রিপুরা পর্য্যন্ত ছিল। সে সময় মগদের বসতি ও প্রতিপত্তি রাঙ্গামাটিতে অধিক ছিল। মগরা চিরদিনই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। যুঝার ফা মগদের জয় করে রাঙ্গামাটিতে রাজধানী স্থাপন করেন। কালক্রমে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ত্রিপুরারাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল।

সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সেঙ্গাচী নামক একজন চৈনিক ভ্রমণকারী সমতটে আসেন। সেসময় সমতটের সিংহাসনে রাজভট্ট অধিষ্ঠিত। সমতটেরাজধানী তখন ছিল পাটিকারা। কমলাঙ্কও তখন পাটিকারার ন্যায় সমতটের অন্তর্ভুক্ত। সমতট নামটি বৌদ্ধ প্রভাবেরই পরিচয় বহন করে। চীনপরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ যে সমতটের কমলাঙ্কে বৌদ্ধপ্রভাবের আধিক্য দেখেছিলেন তাতে কমলাঙ্কে বৌদ্ধপ্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কুমিল্লার অব্যবহিত উত্তরে "পাঁচথুপী" নামে একটি গ্রাম আছে। "থুপ" বৌদ্ধ "স্তূপ" শব্দের অপভ্রংশ। "পঞ্চস্তূপ" থেকেই "পার্চথুপী" হয়েছে বলে অনুমিত হয়। এর দ্বারাই এখানে বৌদ্ধপ্রভাবের সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে ত্রিপুরা নৃপতিদিগের অধীনস্থ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় যে মহাযান বৌদ্ধপন্থীদের প্রতিপত্তি অধিক ছিল, তা গুণাইঘর তাম্রশাসন প্রমাণ করে।

সেঙ্গাচি সমতটের যে বিবরণ দেন তাতে দেখা যায়, সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে সেখানে এক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে তিনি সেখানে এক বৌদ্ধকে রাজত্ব করতে দেখেন। সে রাজার নাম রাজভট্ট। তিনি খড়গ বংশীয় রাজা বলে অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন। তিনি প্রতিদিন বুদ্ধের এক লক্ষ মৃন্ময় মূর্তি তৈরী করতেন। ঢাকার নিকট রায়পুর থানার অন্তর্গত আশ্রফপুরে একটি দানপত্র আবিষ্কৃত হয়। দানপত্রে লিখিত "কর্ম্মান্তি পাটিকারা" (বড) কামতারই সহিত অভিন্ন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

The Subject is future elucidated by N K Bhattasali in"A forgotten Kingdom of Eastern Bengal" (T&Proo A S B 1944 PP 85--91) Good reason from inscriptions is shown for holding that Karmanta is modern Kamta , 12 miles west of Comilla town where numerous ruins and Buddhist images exist This was the capital of the Samatata kingdom which seems to have included the districts of Tripura, Noakhaly, Barisal, Faridpur and the eastern half of the Dacca District (Vincent

Smith's Early History of India, New edition, 4th Ed, p- 415 note)

কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমে নয়াকাম্‌তা ও বড়কাম্‌তা নামে দু'টি গ্রাম আছে। এদের কোন স্থানেই বিশেষ কোন পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ভূ-কৈলাস রাজষ্টেটের প্রধান কাছারি ও ইহার নিকট ও সীমান্তবর্তী চাদিনাকে লোক বড় কাম্‌তাই বলে। এ স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ইহাকে কাম্‌তা মনে করা অস্বাভাবিক নহে। (ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদের কার্য্য বিবরণী, ১৩২৩বাং)

আশ্রফপুর দানপত্রে খড়্গা বংশের নাম আছে এবং খড়গ বংশের চারজন রাজার নাম উল্লিখিত হয়েছে -- খড়্গাগাদ্যম, জাতখড়্গা, দেবখড়্গা, ও রাজরাজ। শেষ রাজা রাজরাজের মঙ্গলার্থেই তাঁর পিতা দেবখড়্গা দ্বারা দানপত্র সম্পাদিত হয়। দানপত্রে লিখিত আছে " রাজরাজ ভট্টস্যায়ুস্কামার্থম্"। খড়্গাবংশ সে সময় সামন্ত বংশ ছিল। " মনে হয় এরা কোন পার্ব্বত্য কোমের প্রতিনিধি।" (নীহার রঞ্জন রায়)। ত্রিপুরাব নৃপতিদের অধীনে সে সময় পাটিকারা রাজ্য। খড়গবংশের শেষ রাজা রাজরাজভট্ট বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। হুয়েন সাঙের বিবরণ অনুসারে খড়্গাবংশ তখন কমলাঙ্কে রাজত্ব করতেন। কমলাঙ্কে তখন বৌদ্ধপ্রভাব ছিল।পাটিকারা রাজ্যও তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র হয়েছিল।"ময়নামতীর গানে" তার প্রমাণ বিদ্যমান। পাটিকারা কমলাঙ্ক উভয় রাজ্যই তখন মেহেরকুলের অন্তর্গত। মেহেরকুল সে সময় ত্রিপুরা -নৃপতিদের অধীনে।

৯৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় (H.B.D.U.P.135) পূর্ব্ববঙ্গে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব নামে এক রাজা ও তাঁর পত্নী বিন্দুমতী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রবংশ নামে এক বৌদ্ধরাজবংশ অধিষ্ঠিত ছিল। সে রাজবংশের প্রথম পুরুষ পূর্ণচন্দ্র রোহিতগিরি বা কুমিল্লা লালমাই পাহাড় থেকে আসেন এবং বৌদ্ধ বলে তাঁর পরিচিত ছিল। চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত দৈলবাড়ি গ্রামে তামার উপর সোনার গিল্‌টি করা একখানি সিংহবাহিনী দশভূজা মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। তাহার লিপিতে খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গা, ও দেবখড়্গা ও দেবখড়্গার মহিষী মহাদেবী প্রভাবতীর নাম আছে। তিনি এর প্রতিষ্ঠা করেন। এ থেকে পাটিকারা হতে দক্ষিণ - পূর্ব্বের চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত খড়্গাবংশের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। (ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৩বাং কার্য্য বিবরণী)

এই দেবখড়্গা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। রাণী প্রভাবতী দুর্গার উপাসিকা। সুতরাং রাজা রাণীর ব্যাক্তিগত ধর্মমতকে পরিত্যাগে বাধ্য করেন নি। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ত্রিপুরার রাজগণও শৈবধর্মানুরাগী হয়েও কোনদিন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হন নেই। স্বাভাবিক ভাবেই হয়তো এ উদারতা খড়্গা নৃপতিদের প্রভাবান্বিত করেছিল।

ত্রিপুরা জেলার পয়ার গ্রামে গুপ্তপরতী যুগের বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোথাও এক সময় পন্ডিত বিহার ছিল। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দাস সে বিহারটির সন্ধান করতে পারেন নি। তৎসত্ত্বেও তা বৌদ্ধতন্ত্র ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পাটিকারায় কনকস্তূপ বিহার ছিল। কেউ কেউ এ কনকস্তূপটি কাশ্মীরে ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নলিনী দাশগুপ্তের মতে কনক স্তূপ বিহারটি

কুমিল্লা জেলাব পট্টিকাবায ছিল। এ পট্টিকেবা বা পাটিকাবাব অবস্থান নিযেও অনেক মতদ্বৈধ আছে । ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিগত মহাযুদ্ধেব সময সামবিক প্রযোজনে খননকার্যেব কালে কুমিল্লাব অনতিদূবে লালমাই মযনামতী পাহাডে বহুপ্রাচীন স্তূপ, মন্দিবেব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয এবং ইহা প্রাচীন পট্টিকেবা বাজ্য বলে নির্দ্ধাবিত হয ।১০৪৪ ১০৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত ব্রহ্মেব বাজা অনিকদ্ধেব অধীনে পট্টিকেবা বাজ্য ছিল । ব্রহ্মবাজ ক্যনজিথেব (১০৮৪ ১১১২) কন্যাব সহিত পট্টিকেবাব বাজপুত্রেব ব্যর্থ প্রেমেব কাহিনী আখ্যানে আছে । মযনামতি পাহাডেব প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে পট্টিকেবাব বাজা হিসাবে বণবঙ্কমল্ল শ্রীহবি কালদেবেব নাম পাওযা যায। বাজমন্ত্রী শ্রীধডি এ পট্টিকেবা নগবেব এক বৌদ্ধ বিহাবেব জন্য কিছু জমি দান কবেন । বাজমন্ত্রীব পিতাব নাম ছিল হেদি - দেব এবং তাম্রশাসনেব লেখকেব নাম মেদিনী - এব । এ সব নামেতে ব্রহ্মদেশীয ছাপ বযে গেছে । পট্টিকেবায বুদ্ধেব একটি ব্রোঞ্জমূর্তি আবিষ্কৃত হয । বিক্রমপুবেব একটি দাৰুবুদ্ধমূর্তি চট্টগ্রামে বক্ষিত আছে। পববর্তীকালে বৌদ্ধ অধ্যুষিত পাটিকাবা বাজ্য লোপ পেযে মেহেবকুলেব অর্ন্তভুক্ত হয । মেহেবকুলেব শেষ বাজা বণবঙ্কমল্ল পাটিকাবা ও কমলাঙ্কেব সমযকাল ১২১৯ খৃষ্টাব্দ । ত্রিপুবাব ইতিহাস বাজমালায লিখিত আছে যে, ত্রিপুববাজ ছেংথুংফা'ব (সিংহতুঙ্গফা'ব) সময গৌডেব সঙ্গে ত্রিপুবাব যুদ্ধ হয এবং ছেংথুফাং যুদ্ধ কবতে ভীত হলে তাঁব বানী ত্রিপুবাসুন্দবী সে যুদ্ধ জয কবেন এবং মেহেবকুল ত্রিপুবা বাজ্যভুক্ত হয । "মেহেবকুল ত্রিপুবাব এই মতে হৈল "। বাজমালা গ্রন্থে গৌডবাজেব নাম নেই, কিন্তু বাজামালা থেকে জানা যায, ছেংথুংফা'ব প্রপৌত্র বত্নফা তোঘবল খাঁব সমসামযিক । সুতবাং ইহা প্রতিপন্ন হয যে , লক্ষণসেনেব সমযই ত্রিপুবা আব গৌডেব মধ্যে যুদ্ধ হয । লক্ষণসেন ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাজত্ব কবেন। বণবঙ্ক তাঁব সমসামযিক । সুতবাং বণবঙ্কেব সমযেই মেহেবকুল ও পাটিকাবা যে ত্রিপুবা বাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত হয, তা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব । এ ভাবে ১২শ শতাব্দীতে যে ত্রিপুব বাজগণ সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুবা দেশে শাসন কবতে সক্ষম হন । সে সময ও তাবও পবে যে বৌদ্ধধর্ম ত্রিপুবায ছিল তাব প্রমাণ মেলে "পঞ্চবক্ষা " নামক একখানি বৌদ্ধধর্ম্মেব পুঁথি থেকে ।১২৮৯ খৃষ্টাব্দে গৌডেব বাজা মধুসেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁব সমযই " পঞ্চবক্ষা" বইটি লিপিবদ্ধ হয । গৌড সে সময ত্রিপুবাব নৃপতিদেব অধীন ছিল, সে কথা পূর্বে বলা হযেছে।

সেন বর্মণ যুগে ত্রিপুবায বৌদ্ধধর্ম্মেব প্রভাব কমে আসে । দ্বাদশ - ত্রযোদশ শতকেব শেষেব দিকে ত্রিপুবাব মহাবাজা জগৎমাণিক্য "ক্রিযাযোগসাব " সংস্কৃত গন্থটি অনুবাদ কবেন। "ক্রিযাযোগসাব" গ্রন্থে দশাবতাবেব উল্লেখে বুদ্ধেব কথা আছে । বুদ্ধদেব বিষ্ণুব অন্যতম অবতাব বলে যখন স্বীকৃত হলেন, তখন বেদবিবোধী যজ্ঞবিবোধী বুদ্ধদেব অনাযাসে ব্রাহ্মণ্য ধ্যানেব মধ্যে মিশে গেলেন । বৌদ্ধ পালবাজত্বেব শেষভাগে ত্রিপুবায নাথধর্ম্মেব প্রচাব আবম্ভ হয ।

বর্তমান ত্রিপবাব উত্তবে সিধাই থানা অবস্থিত। সেখানে একটি প্রাচীন দীঘি আছে । সে দীঘিটি সিদ্ধাব দীঘি নামে পবিচিত । "গোবক্ষ বিজয" পুঁথিতে সিদ্ধানাথেব অপভ্রংশে " সিধাই" কথাব উল্লেখ আছে।

সে হিসাবে সিধাই নামটি সিদ্ধার নামের জন্যই হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। বৌদ্ধপ্রভাবিত লালমাই পর্বতে চৌরঙ্গীনাথ নামে এক সিদ্ধার বাড়ি ছিল। ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়ে ভোজের রাজার অধিষ্ঠান ছিল।" ভোজ রাজার কোট" "ভোজের দীঘি" তার নিদর্শন। ময়নামতির মেয়ে লালমতি এবং ভোজের উপাখ্যানে নাথ উপাসক যোগী কাপালিকের উল্লেখ আছে। কাপালিক শৈবসাধক। কাপালিকের ইষ্টদেবতা নাথ। নাথ শিবের সহিত অভিন্ন। এতে সিদ্ধনাথ সম্প্রদায় বৌদ্ধভাবাপন্ন হলেও যে মূলতঃ শৈব তান্ত্রিকপন্থী ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায় এবং পরবর্ত্তীকালে কিছুটা তান্ত্রিকধর্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্র' করেছিল। ময়নামতীর প্রভাবে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত লালমাই পাটিকারায় তাঁদের সাধনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২৪ বাংলা সনে লালমাই পাহাড়ের টপকামুড়া নামক একশৃঙ্গ বিনষ্ট ও ভূগর্ভে নিহিত এক ভগ্ন দেবালয়ে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত অতিক্ষুদ্র একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। এ মূর্তি যে স্থানে পাওয়া গেছে, সে স্থান থেকে মাণিকচন্দ্রের বিনষ্ট বাসভবন ২০০ কি ৩০০ গজ দূরবর্ত্তী। তবেই অনুমান করা যায়, নাথ প্রাধান্যের যুগেই বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে অপসৃয়মাণ হতে থাকে।

যে বৌদ্ধধর্ম পঞ্চম শতাব্দী থেকে দশম একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা তথা ভারতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল, তা ঊনবিংশ - বিংশ শতাব্দীতে এসে ধীরে ধীরে সংখ্যাল্পতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সে পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরায়ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কমতে থাকে। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দে (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সাস বিবরণী পুস্তকে বৌদ্ধদের বিবরণ অধ্যায়ে আছে, "বৌদ্ধগণের সংখ্যা ত্রিপরা রাজ্যে ১৪৫৩১ জন। সমগ্র ত্রিপুরার জনসংখ্যার শতকরা ৩ জন লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ১৩১০ ত্রিপুরাব্দ হতে ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সেন্সাসে বৌদ্ধগণের সংখ্যা এবং হ্রাস - বৃদ্ধি ছিল নিম্নরূপ ঃ— ১৩১০ ত্রিপুরাব্দে ৫৯৯৯ জন, ১৩২০ ত্রিপুরাব্দে ১০১৪৭ জন। যদিও বৌদ্ধধর্ম এককালে হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে পাহাড়িয়া শ্রেণীর কতিপয় উপজাতি ব্যতীত বাংলার সমভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্মালম্বী ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। এ রাজ্যে প্রধানতঃ চাক্‌মা ও মগগণই বৌদ্ধ। ইহারা এ রাজ্যে আদিম অধিবাসী নহে। পার্বত্ত চট্টগ্রাম হইতে তাহারা এ রাজ্যে আগমন করিয়াছে। চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বিভাগ সমূহে যথা বিলোনীয়া, সাবরুম, অমরপুর ও কৈলাসহরে প্রধানতঃ বৌদ্ধগণের বাস দৃষ্ট হইয়া থাকে"। উপরোক্ত সেন্সাস রিপোর্ট থেকে আমরা বলতে পারি, ত্রিপুরা বৌদ্ধ-অধুষ্যিত অঞ্চল ছিল।

১৯৪৬ ইং সনে ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর বর্ত্তমানে কুঞ্জবনে অবস্থিত "বেনুবন বিহার" নামে বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও "বেনুবন বিহার" প্রতিষ্ঠার পূর্বে ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় বৌদ্ধমন্দির ছিল। সাবরুমের বংকুল রূপাইছড়িতে, বিলনীয়ার ইলেবারু ও কলসীতে ধর্ম্মনগরে পেচারথলে, কমলপুরে কুলাই হাওরে, কৈলাসহরে মনুঘাটে, ময়নামায়, ছামনুতে, তেলিয়ামুড়ার চাকমা ঘাটে, কাঞ্চনপুরে, মাছমারায়, বৌদ্ধ মন্দির আছে।

"বেনুবন বিহার" ত্রিপুরার সমস্ত বৌদ্ধমন্দিরগুলির শীর্ষস্থানীয়। বেণুবন বিহারের চতুর্দ্দিকের

প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম ।এ বিহারেই বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মর্চ্চা, বৌদ্ধ বিনয়াসম্মত ভাবে (Buddhist code of discipline) বুদ্ধ - বন্দনা, পূজা - অর্চ্চনা এবং বিবিধ - আচার অনুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বুদ্ধের ২৫০০-তম পরিনির্বাণ জয়ন্তী উৎসব ১৯৫৫ খৃঃঅব্দে সারাবিশ্বে সংগঠিত হয় ।সে সময় " ত্রিপুরা বুদ্ধজয়ন্তী কমিটি " ও ত্রিপুরা সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক বৎসরের কর্ম্মসূচির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় । তারপর থেকেই প্রতিবৎসর " ত্রিপুরা বুদ্ধজয়ন্তী কমিটি" ঐ দিনটিতে বহিত্রিপুরা থেকে বৌদ্ধধর্মে সুপন্ডিত মনীষীদের আনয়নপূর্ব্বক উৎসব ভাষণ দানের ব্যবস্থা করেন । ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত , ১৯৬৪ খৃঃ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, ১৯৬৬ খৃঃ ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৮ খৃঃ অধ্যক্ষ জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এখানে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন এবং বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে ভাষণ দেন ।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বেনুবন বিহারের পরিচালনায় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বিহারের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় । বিদ্যালয়ের নামাকরণ করা হয় " মৈত্রী ভারতী বিদ্যায়তন।" ত্রিপুরায় পালি ভাষা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বেনুবন বিহারে " ত্রিপুরা পালি ইনষ্টিউট" গড়ে উঠে । পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ দ্বারা ইহা অনুমোদিত হয় । ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় " ত্রিপুরা রাজ্য বুদ্ধিষ্ট এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। বেনুবন বিহারের মধ্যে ইহার কার্য্যালয় ।এ সমিতির সঠিক কী কাজ, জনসাধারণের নিকট সুষ্ঠুভাবে তা এখনও প্রচারিত হয় নি ।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববৌদ্ধ সম্মেলন সিংহলে অনুষ্ঠিত হয় । তাতে পৃথিবীর ৪৫টি দেশ যোগদান করেন । ত্রিপুরা তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে " ওয়ালর্ড ফেলোশীপ অব বুদ্ধিষ্ট " দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন জাপানে টোকিও নগরে, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় অধিবেশন রেঙ্গুনে, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে এশিয়ায় সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অধিবেশনে ত্রিপুরার প্রতিনিধি যোগদান করেন ।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নয়াদিল্লীর ব্রহ্মদূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী আউং ব্রহ্ম সরকারের পক্ষ থেকে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মার হস্তে ৪৫ খন্ড মূলগ্রন্থ ও ৪৮ খন্ড সঙ্গায়ন ত্রিপিটক অর্পণ করেন ত্রিপুরার জন্য ।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বিশ্ব বৌদ্ধ সভার পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । সে অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার "বেনুবন বিহারের " প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি নিম্নে দেয়া গেল :

Considering that his Highness the Maharaja Bir Bikram Kishore Deb Barman Bahadur of Tripura State, India, has built a magnifcient Buddlist temple named ' venubana vihara ' (pali Veinvana vihara) at Agartala, which has been the main centre of Buddhist activities in Tripura, resolves that the W.F.B at this fifth

conference in Bangkok expresses and conveys its thanks and appreciation tc H.H the Maharaja Bir Bikram Kishore DebVarman Bahadur of Tripura State for building the magnificent Venuvana vihara in his capital at Agartala for the purpose of cultivating and disseminating the Buddha Dharma in Tripura State. "(Page - 101 Report of the general conference of the World Fellowship of Buddists Bangkok, Thailand, 1958)

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ জুলাই ত্রিপুবার অন্যতম শিল্পী শ্রীশক্তি হালদার বুদ্ধের জন্ম থেকে মহানির্বাণ পর্য্যন্ত ২০টি ছবি অঙ্কন করে বেনুবন বিহারকে দান করেন। এই কুড়িটি তৈলচিত্র হল, – (১) মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন, (২) ভবিষ্যদ্বাণী (৩) হলোৎসব (৪) করুণা (৫) জরাব্যাধি ও মৃত্যুদর্শন (৬) অশোকভান্ড বিতরণ (৭) অভিনিষ্ক্রমণ (৮) জ্ঞানান্বেষণ (৯) সুজাতার পায়েসান্ন দান (১০) মার বিজয় (১১) বন্ধুত্বলাভ (১২) ধর্মচক্র প্রবর্তণ (১৩) রাহুলের পিতৃধন ভিক্ষা (১৪) বিম্বিসার রাজার যজ্ঞ (১৫) চন্ডাল কন্যার হাতে জলগ্রহণ (১৬) রোগীর সেবা (১৭) কিসাগৌতুমীর মৃত পুত্র (১৮) মত্তহস্তী দমন (১৯) অঙ্গুলীমাল দমন এবং (২০)মহাপরিনির্বাণ।

এই বিশটি তৈলচিত্র বুদ্ধমন্দিরে গৌরব ও শোভা বর্দ্ধন করছে নিঃসন্দেহে। জনসাধারণও এ ছবিগুলির মাধ্যমে বুদ্ধের সমস্ত জীবনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসকে বুঝে উঠতে পারছেন বা পারবেন।

সর্ব শেষ একটি কথা লিখে প্রবন্ধ শেষ করছি। সারা বিশ্বে বর্তমানে ৭৯টি বৌদ্ধধর্ম্মের আঞ্চলিক কেন্দ্র (Regional centre) আছে। ত্রিপুরা তার মধ্যে অন্যতম কেন্দ্র। ইহা ত্রিপুরার পক্ষে গৌরবের বিষয় ১৯৮৫ খ্রীঃ ১১ইং এবং ১৩ নভেম্বর —— বিশ্ব বুদ্ধিষ্ট ফেলোশিপের আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বেনুবন বিহারে।

ত্রিপুরার পত্র-পত্রিকায় সংহতি-চেতনা

সংবাদ পত্রে সংহতি বিষয়ক খবরের আলোচনায় প্রবেশ করার মূহূর্তে দু'একটি কথা এখানে বলে নিতে হয়। সংহতি আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যবহারিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন আছে। এবং আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও উপরোক্ত কথাগুলো প্রযোজ্য।

বিগত শতাব্দী থেকে আজ পর্য্যন্ত কয়েকশত পত্রিকা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রত্যেকটি পত্রিকার সংহতি বিষয়ক খবরের আলোচনা এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে নেয়া সম্ভবপর নয়, সুতরাং বিস্মৃত প্রায় পত্রিকা থেকেই অধিক উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল থেকে মুদ্রিত প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা 'অরুণ' প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরায় সেসময় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সে সময় স্বাভাবিক করেণেই সকলে আশা করেছিল রাজার সঙ্গে প্রজার মধুর সর্ম্পক গড়ে উঠুক। কিন্তু সে সময়ে দেখা গেছে প্রজার সুখ দুঃখ যেমন রাজার দরবারে সঠিক ভাবে পৌঁছিতে পারেনি তেমনি রাজাও অন্তব দিয়ে প্রজার সুখ-দুঃখের সঙ্গে একত্রীভূত হতে পারেননি। তাই সময় সময় বহু ক্ষেত্রে রাজাব সঙ্গে প্রজাব ব্যবধান থেকেই গেছে। ফলশ্রুতি হিসাবে সেখানে রাষ্ট্রীয় সংহতি পরিণতি লাভ করেনি।

দ্বিতীয়তঃ সেদিন ব্রিটিশ এলাকার প্রজাদের সঙ্গে ত্রিপুবা বাজ্যের প্রজাদের ব্যবহাবিক জীবনে বহু লেনদেন থাকায় ব্রিটিশ ও ত্রিপুরা রাজের সঙ্গে প্রজাদেব প্রশাসনিক একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠে। এবং সে প্রশ্নে সেদিন সংহতির প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, তাই সংহতি গড়ে তোলার একটা সুপ্ত প্রয়াস জেগেছিল 'অরুণ' পত্রিকার সম্পাদক গোষ্ঠীর মাঝে।

তাই প্রথম বর্ষের প্রথম 'অরুণ' লিখিল —"এখানে নবপতি প্রজার হিতেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া যে সকল ভাব ব্যক্ত করে, তাহা যথাযথ রূপে রাজা প্রজা উভয়ের নিকট নানা কারণে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এরূপ স্থলে উভয়ের মনের ভাব উভয়ের নিকট প্রচার করিবার পক্ষে সংবাদ পত্রই উপযুক্ত উপায়।

ত্রিপুরা রাজ্যে দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজার সহিত ত্রিপুরাবাসীর সম্বন্ধ ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের সর্ম্পকও ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতেছে, সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে উভয় রাজ্যেব প্রজাবর্গের এবং রাজ কার্য্যের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। এই উৎসুক চরিতার্থ করিবার পক্ষে সংবাদ পত্রের ন্যায় প্রকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা সবারই জানা আছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ঐ সনেই 'অরুণ' পত্রিকার জন্ম। সেদিনকাব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব ঢেউ যখন ত্রিপুরায়ও পৌঁছাল তখন এখানেও জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সংহতির প্রশ্ন দেখা দিল। বিদেশী দ্রব্য বর্জনেব মাধ্যমে একটা সংহতি ত্রিপুরায়ও গড়ে উঠেছিল। এবং সংহতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এখানে একটি স্বদেশী দোকান কবাব প্রস্তাব

নেয়া হয়েছিল এবং সে প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য কিছু টাকাও সংগ্রহ করা হয়েছিল জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে। এসব আমরা জানতে পারি 'অরুণ' পত্রিকার মারফৎ। দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি যা থেকে এই পত্রিকা সে সময় উক্ত সংহতিকে কী ভাবে উৎসাহিত করেছিল তা অনুধাবন করতে পারি।

" এই স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় জীবনদান করিয়াছে, জাতীয়একতা আনয়ন করিয়াছে। জাতীয় মহাসমিতি যাহা করিতে পারে নাই, স্বদেশী আন্দোলন তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে।"(সংবাদ সূত্র ঃ- অরুণ — ১ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১৯০৫ খৃঃ।

" ফুলার প্রভুর অনুচরগণ সহসা ইংরাজ জাতির উচ্চনীতি পরিবর্ত্তন পূর্বক প্রকাশ্য ভাবে রাজ-বিধি ন্যায় ও ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছা পূর্বক শান্তিময় রাজ্যে অশান্তি উৎপাদন ও অস্বাভাবিক ভাবে আমাদের উন্নতিরূপথ অবরোধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। একপ্রাণ হইয়া কাজ করিতে শিখিয়াছি। জাতীয়তার জয় হইয়াছে, ভেদনীতি হার মানিয়াছে।" (সংবাদ সূত্র --অরুণ, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ১৯০৫খৃঃ)।

" এখানকার কোন দোকানে যথেষ্ট পবিমাণে দ্রব্যাদি না থাকাতে, যাঁহারা স্বদেশীয় বস্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক তাহাদের অভিলায পূর্ণ হয় না। এই অভাব দুর করিবার জন্য এখানে কেবল স্বদেশীয় দ্রব্যেবই একটি দোকান খুলিবাব আয়োজন হইয়াছে। ১০ টাকা করিয়া অংশ লইয়া এই দোকানেব মূলধন সংগ্রহ করা হইতেছে। এপর্য্যন্ত ১৩০০ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে। স্থানীয় কর্মচারীদের মধ্যে অনেক এবং সম্ভ্রান্ত ঠাকুরলোক ও উকিলদের মধ্যেও কেহ কেহ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত স্বদেশী দোকানের দুর্দ্দশা না ঘটে, এই উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হইয়াছে কোন কারণেই বাকী বিক্রয কবা হইবে না।" (সংবাদ সূত্র অরুণ, ১ম বর্ষের ১০ম সংখ্যা) ১৯০৫ খৃঃ।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কিশোরসাহিত্য সমাজের মুখপত্র হিসাবে ত্রৈমাসিক 'রবি' পত্রিকা প্রকাশিত হয় মহারাজ বীরবিক্রমের সময়কালে। মহারাজ বীব বিক্রম তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যে প্রজাদের মাঝে সম্প্রতি বজায রাখার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাখতেন। এবং রাজা ও বিভিন্নধর্মী প্রজাদেব মধ্যে সংহতি না থাকলে রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না — সে কথা মহারাজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই সর্ব সময়ে কথায় - আচরণে প্রজাদের সৎ-পরামর্শ দিতেন। তাঁর রাজত্বকালে সমগ্র ভারতে হিন্দু মুসলমানের অনর্থক রেযারেষি প্রবেশাধিকাব পায়নি। তার একমাত্র কারণ মহাবাজ হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, বা অন্য সম্প্রদায়েরই হোক সাবইকে সমান স্নেহে দেখতেন। এবং সবারই নিকট সংহতি বজায় রাখবার আবেদন তাঁর বক্তৃতার মাঝে রাখতেন। তারই নিদর্শন 'রবি' পত্রিকার পাতায় পাতায় দেখি। নিম্নে দু'একটি উদারণ দিচ্ছি।

"এই গণতন্ত্রের যুগে চারিদিকে যে স্বায়ত্ত শাসনের ভেরী বাজিতেছে — আমিও এক পুরাতন যুগের স্বায়ত্তশাসনের দীন প্রতিনিধি। প্রাচীন ভারতে ধর্ম - নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের সহিত ধমাধীন গণতন্ত্রের বিরোধ কদাপি ছিলনা এবং আধুনিক পাশ্চাত্য স্বায়ত্তশাসনের মুখপাত্র স্বরূপে আপনারা আজ আমার যে সম্বর্দ্ধনা করিয়েছেন পরোক্ষ সেই অতীত যুগের স্বায়ত্তশাসেনের প্রতিও ইহা আপনাদের অন্তর্নিহিত প্রীতির পরিচায়ক। তাই ব্যক্তিগত ভাবে এবং প্রাচীনযুগের সম্মিলিত রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আমি

আপনাদিগকে আমার গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। (সংবাদ সূত্র — কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এবং সদর লোকাল বোর্ডের সদস্য বৃন্দের অভিনন্দনের উত্তরে মহারাজ বীরবিক্রম — রবি ৪র্থ সংখ্যা, ১৯২৮ খৃঃ)

" ত্রিপুরা জিলাস্থ আমার অনেক প্রজাই মুসলমান। সর্ব্বান্তিকরণে আমি তাহাদের মঙ্গল কামনা করি। আমার প্রজাপুঞ্জের শিক্ষাবিস্তার, তাহাদিগের আর্থিক অস্বচ্ছলতা নিবারণ এবং স্থানীয় আধি- ব্যধির প্রতিষেধকল্পে আমার যাহা সাধ্য তাহা আমি সর্বদাই করিতে প্রস্তুত আছি। আপনারা বিশ্বাস করুন যে, সমাজ থাকিলেও সন্ন্যাসীর ন্যায় রাজার জাতি নাই বা সর্বজাতিই রাজার জাতি।" (সংবাদ সূত্র খাদিমল ইসলাম প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দের অভিন্দনের উত্তরে —রবি, ৪র্থ বর্ষ,২য় সংখ্যা, ১৯২৮খৃঃ)। কুমিল্লার আঞ্জুমান ই-ইসলামিয়ার সভ্যদের অভিন্দনের উত্তরে সেদিন মহারাজা বলেছিলেন —" ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ- অনল দেশের ও দশের যে কি ক্ষতি করিয়াছে তাহারই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ত্রিপুরা আজ ধন্য।

পৃথিবীব্যাপী বিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক বিবোধের এই ক্ষণে, ব্যক্তিগত ভাবে এবং শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি স্বরূপে ইহাই আমার পরম সম্মান যে, সমাজ সম্প্রদায় বিস্মৃত সম্মিলিত জনসাধাবণ কর্তৃক আজ আমি অভ্যর্থিত।

আমি আজ সরলভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি, পাবিপার্শ্বিক আবাহওয়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আবহাওযা আমাব বাজ্যে সৃষ্টি করা ইহাই আমাব সর্ব্বোচ্চ এবং একমাত্র আকাঙ্খা। যাহাদিগের ভাগ্য আমার নিজের ভাগ্যের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত, হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, আমি তাহাদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিতে চাই যে, বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে অথবা বর্ণে বর্ণে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার পার্থক্যের স্থান নাই। প্রতি সম্প্রদায় একই আদর্শ,লক্ষ্য এবং পবিণতিব সুনিয়মে সুনিযন্ত্রিত। দৃশ্যমান বৈষম্য কেবলমাত্র বহিরাবরণেই পর্যবসিত। এই বৈষম্যেব অন্তরালে মানবাত্মা,সামা-মৈত্রীব অনুপ্রেরণায় পরস্পরের নিকট পূজা এবং প্রণয়ের দাবী বাখে।" (সংবাদ সূত্র —রবি, ৪র্থ বর্ষ,৩য় সংখ্যা)। বলা বহুল্য, এই বক্তব্য 'রবি' পত্রিকায় অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ কর্বোছল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এর মাধ্যমে দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি — এই যুগ সন্ধিক্ষণে সেদিন সারা দেশে এক অস্থিবতা দেখা দেয় — যার ফলে জনজীবন বহু দিক থেকে বহু সমস্যাব সম্মুখীন হয়। সে অস্থিরতা থেকে ত্রিপুবাও সেদিন বাদ পড়েনি। একদিকে যেমন পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমন হেতু সমস্যার সৃষ্টি হল — অপরদিকে বহু পবোক্ষে অনেক রাজনৈতিক দল রাজতন্ত্রের সপক্ষে ও বিপক্ষে থেকেও যায়। স্বাধীনতার পরও রাজনৈতিক দলের মধ্যে কিছুটা মিল অমিল থাকা সত্বেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে তাদের মাঝেও সংহতিমূলক কার্য্যকলাপের নিদর্শন মেলে। অপরদিকে সে সময় ত্রিপুরারাজ্যকে পাকিস্তানে যোগ দেবাব জন্য তৎকালীন মুসলীম লীগ সেক্রেটারী হবিবুল্লার প্রচেষ্টা — যাকে ভিত্তি করে কিছুটা ভিতরে বাহিরে ষড়যন্ত্রও চলছিল। তখন দেখা যায় ত্রিপুরার সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একত্রে মিলে সংহতির স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে। দলমত নির্ব্বিশেষে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগত পাহাড়ীপ্রজা, জাতি উপজাতি হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মেব মাঝে ঐক্যতার স্বপক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এবার সংবাদপত্র থেকে কিছু উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছি — উপরোক্ত ঘটানার

পরিপেক্ষিতে ।

" প্রজা মজলিসের সভাপতির ভবনে স্টেট কংগ্রেস, ত্রিপুরারাজ্য প্রজামন্ডল, ত্রিপুরা জনশিক্ষা সমিতি, সেংক্রাক, মণিপুরি শিক্ষা সমিতি, ত্রিপুরা কৃষ্টি সংসদ ও কমিউনিষ্ট পার্টির এক ঐক্যবদ্ধ সম্মেলন হইয়াছে। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় "১৫ই আগষ্ট সর্বদলের সমবেত উদ্যোগে এক বিরাট জন সভার আয়োজন করা হইবে। এই সভায় ভারতীয় ইউনিয়ন পতাকা উত্তোলন করা হইবে এবং অগৌণে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র লাভ করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে।" (সংবাদ সূত্র — ত্রিপুরা রাজ্যের কথা — ১ম বর্ষ ১১সংখ্যা, সম্পাদক বীরেন দত্ত ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৭ ইং)।

ঐ সংখ্যাতেই আমরা দেখি অঘোরচন্দ্র দেববর্মা ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন রাখতে গিয়ে বলেছেন — " বৃটিশ রাজনৈতিক ধুরন্ধুরদের কুটিল চক্রে অখন্ড ভারত দ্বিখন্ডিত হইতে চলিল। শত সহস্র বৎসরের দাসত্বের অভিশপ্ত জীবনই আজ ভাবতবাসীর পবস্পবেব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবিয়া আত্মাঘাতী কলহে প্রবৃত্ত হইয়া এমন কি আত্মবিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে। তাই আজ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাব বিযাক্ত আবহাওয়া ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অতি সৌভাগ্যেব বিষয় আমাদের পাবিপার্শ্বিক আবহাওয়া অতি বিযাক্তময় হওয়া সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষীদের প্ররোচনা ও রটনা ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের শান্তি ও প্রগতিকামী প্রজাদের মনে বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ত্রিপুরা জাতি আবহমান কালের ন্যায় রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত চিরবন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। ইহা শুধু ত্রিপুরা ও মুসলমানেরই গৌরবের বিষয় নহে। রাজ্যবাসী প্রত্যেকটি প্রজারই গৌরবের বিষয়।" (ত্রিপুরা রাজ্যের কথা ১ম বর্ষ। ১১ সংখ্যা, ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৭ ইং)।

মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজ্যের যাবতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রজাবর্গেব সভা- সমিতি প্রস্তাব করেছিল 'রিজেন্ট মহোদয়ার, এড্ভাইজাবী কাউন্সিলে যেন ষ্টেইট সাবজেক্টরে সর্ব্বদলেব প্রতিনিধি নিয়ে গঠন করা হয় । কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল তার পরিবর্তে বিজেন্ট মাতা মহারাণী শাসন পরিষদে তিনজন বে-সরকারী মন্ত্রী নিয়োগ করলেন। এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে সর্ব্বদল সংহতির প্রশ্নে একত্র হয়ে দাবী জানালেন —" অন্তবর্তী সরকার চাই, সভা -সমিতির অবাধ অধিকার চাই, অগৌণে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন চাই।" সেদিনকার সর্ব্বদলের সংহতির কিছু খবর পুরানো পত্রিকা থেকে তুলে দিচ্ছি।

" সর্বদলীয় আহ্বানে বার হাজার ত্রিপুরী হিন্দু মুসলমান এক বিরাট জনসভায় সমবেত হয। বেলা বারটার পর হইতে মুক্তিকামী ত্রিপুরী হিন্দু- মুসলমান দলে দলে মিছিল করিয়া আপন প্রতিষ্ঠানে জমায়েত হইতে থাকে। জনশিক্ষার আহ্বানে বিশ ত্রিশ মাইল দূব পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে বলিষ্ঠ কৃষক ত্রিপুরগণ আসে। মুসলিম প্রজা মজলিসের স্বেচ্ছা সেবকগণ কেন্দ্রীয় অফিসে আসে। সহরের ভদ্রঘরের ছেলে, মেয়েরা কংগ্রেসের টুপি মাথায় রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে। তাহাদের সাথে দেখা যায় চা-বাগানের কুলির দল,সহরের ভাংগী ভাইযেরা। প্রজামন্ডল সেংক্রাক ত্রিপুবা সংঘ ও জনশিক্ষার নেতৃত্বে এক বিরাট পার্বত্য ও সহরের ত্রিপুরী নর- নারীর শোভাযাত্রা স্কুল-ময়দানে সমবেত হয়। সেখানে ভারতীয় ইউনিয়ন পতাকা উত্তোলন করেন সর্বত্যাগী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল সিংহ (কংগ্রেস সভাপতি) সংকল্প বাক্য

পাঠ করেন শ্রীযুত সুখময় সেনগুপ্ত ।ত্রিপুর সংঘের সভাপতি শ্রীযুত ললিতমোহন দেববর্মণ সভার পৌরোহিত্য করেন ।প্রজা মজলিস নেতা মৌঃ ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী সাহেব প্রস্তাব করেন --"১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসানে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা হস্তগত হওয়ায় ভারতবাসী মাত্রই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাবৃন্দ প্রত্যক্ষ ভাবে বিশেষ উপকৃত না হইলেও ভারতবাসী হিসাবে একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে উৎসবে অংশ গ্রহণ করিতে সমবেত হইয়াছে। আজিকার এই যুগপরিবর্তনের সাথে ভারতের জনসাধারণের গণতন্ত্রের অধিকার প্রসারিত হইলেও ত্রিপুরা রাজ্যের আমলাতান্ত্রিক শাসনের পাষাণ ভার অপসারিত না হওয়ায় ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করিতেছে না ।" প্রজামন্ডলের সম্পাদক শ্রীযুত বীরচন্দ্র দেববর্মা বলেন – " আজ সমগ্র রাজ্যে ১ম এই অনুভব জাগিয়াছে আমরাও স্বধীনতা চাই ।এই অনুভব অতীব তীব্র ও সক্রিয় ।ইহার একমাত্র অর্থ হইতেছে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না ।" ত্রিপুরা সংঘের সম্পাদক শ্রীযুত জীতেন ঠাকুর বলেন – "ইজারাদারী ব্যবস্থায় থাকিয়া আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, কর্ম সকলই ইজারাদারগণের কাছে বন্ধক পড়িয়াছে ।তাই আমরা অশিক্ষিত, মুর্খ, স্বাস্থ্যহীন, সম্পদহীন ।" শ্রীযুক্ত বংশী ঠাকুবাও শ্রীযুক্ত দশরথ দেববর্মা ত্রিপুরা ভাষায় বলেন -- "হে হতভগ্য ত্রিপুরা ভাই বোনগণ তেরশ'শাতন্ন বৎসর রাজশাসনের ফলে তোমার রাজ্যে তোমরা ভাষা জ্ঞান পর্য্যন্ত পাও নাই ।কিন্তু আজ তোমরা দূর দূর অঞ্চল হইতে এখানে আসিয়া প্রমাণ করিয়াছ তোমাদেব আত্মাবসত্য উপলব্ধি ঘটিয়াছ । তোমরাও বর্তমান ব্যবস্থার অবসান চাও ।এই জন্যই প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইয়াছে । সর্ব্বান্তকবণে আমরা ইহা সমর্থন করির্তেছি । প্রজামন্ডল, ষ্টেট কংগ্রেস, ত্রিপুব সংঘ প্রজা মজলিস, কমিউনিষ্ট পার্টি, জনশিক্ষা, কৃষ্টি সংসদ ও ছাত্র,সকল প্রতিষ্ঠান এই প্রস্তাব সমর্থন করিযা একযোগে ঘোষণা করেন --- আমাদের এই আদর্শ লাভ করিবার জন্য একতাকে বজায় রাখিবই ।" (সংবাদ সূত্র – ত্রিপুরা রাজ্যেব কথা সম্পাদক বীরেন দত্ত । ১ম বর্ষ ,১২শ সংখ্যা ২৪শে আগষ্ট, ১৯৪৭ ইং)।

" আজ ছাত্র-সংহতি বজায় রাখবাব জন্য ছাত্রদের এমন একটি সংগঠনে যোগ দিতে হবে, যা স্বধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করবার জন্য ছাত্র সমাজকে প্রস্তুত করতে পারে।" (সংবাদ সূত্র – ত্রিপুরা কংগ্রেস কর্ম্মীদেব কথা ,১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ১লা আগষ্ট, ১৯৪৭ ইং সম্পাদক – সুখময় সেমগুপ্ত)।

" ত্রিপুরা রাজ্যের ভারত ইউনিয়নে যোগদানকে উপলক্ষ করিয়া এক অভাবনীয় অগ্নিপরীক্ষার সম্ভাবনা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে । রাজ্যের সীমান্তে পাকিস্তানীগণের মহড়ার সংবাদ ও হুঙ্কার শোনা যাইতেছে । আজাদ, ইহোদ প্রভৃতি পত্রিকা কয়েকদিন হইতে প্রত্যহই নানারূপ হুমকি ও গুরুত্বপূর্ণ বিরুদ্ধ সংবাদ বহন করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে ।

মাতৃভূমির বিপদে সাধারণ কোন অজুহাতে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন থাকা নৈতিক ও ব্যবহারিক আত্মহত্যার সমতুল্য ।আভন্তরীণ ভেদ দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ।বৈচিত্রময় মানব সমাজে উহা অনেকাংশে সম্ভব ও স্বাভাবিক কিন্তু বহিঃ শত্রুর আক্রমণ ও আঘাতের সম্মুখে সাধারণ বিপদে সমষ্টিগত

আত্মরক্ষার জন্য যদি উহারা একত্রিত না হয় উহার চেয়ে ঘৃণ্য আর কি হইতে পারে ? যদি আঘাত আসে এবং ভগবান যদি চান তবে জাতি ধর্মনির্ব্বিশেষে ত্রিপুর জননীর প্রত্যেক সন্তান মানুষোচিত ভাবে এই মহাপরীক্ষার সন্মুখীন হইবে আমরা আশা করি। এই অভাবনীয় সংকটকালে আমাদের মাতৃভূমি তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের নিকট হইতে পরম আত্মত্যাগ ও পরম কর্ত্তব্য—নিষ্ঠা আশা করেন।" (সংবাদ সূত্র নব জাগরণ ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৯৪৭ ইং সম্পাদক গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও গোলাম নবী)।

" কিন্তু একটা বিষয় পরিস্ফুট হইয়া রহিল — ত্রিপুরার জনসাধারণ বিপদের দিনে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে জানে। ত্রিপুরা এই ভারতেরই একটা অংশ —ভারতের জাগ্রত জনশক্তি নিজেদের ভাগ্য নিজেরা যে ভাবে গড়িতে চায় তাহার সংগে সুর মিলাইয়া ত্রিপুরাও একই দাবী করে, সেও চায় লোকায়ত সরকার। সেও চায় নিজের হাতে নিজেব ভাগ্য গড়িবার অধিকার। ইহা কালের দাবী।" (সংবাদ সূত্র কংগ্রেস ১ম বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ৭ই ডিসেম্বব, ১৯৪৭ খৃঃ— সম্পাদক সুখময় সেনগুপ্ত)।

সেদিন জনশিক্ষা সমিতি সৃষ্টিরপর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজার মধ্যে যে ঐক্যতা, সংহতি দেখা দিয়েছিল নিম্নের খবর থেকে তা জানা যায়।

" দিনটি ১১ই পৌষ। এই রাজ্যের হিন্দু মুসলমান প্রজার জীবনে কি গভীর আলোড়ন আনিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন বর্ণনা করা অসম্ভব। গত ১১ই পৌষ ধরিয়াথল স্কুলপ্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলাম। ধরিয়াথল লেম্বুথল, মান্ডবকাল্লী, আমতলী, লালসিংমুড়া, সুতারমুড়া, রঙ্গমালা, পদ্মনগর, বড়জলা - আমতলী, লাটিয়াছড়া, প্রমোদনগর, পাথালিয়া ঘাট, বড়জলা, চৈমুনী চড়িলাম, কুমারিয়াকুচা, প্রভৃতি ২০টি স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকগণ ধরিয়াথল স্কুলের দিকে ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ, ' 'ত্রিপুরার প্রজা এক হও' প্রভৃতি ধ্বনিতে বিশ বর্গমাইল স্থানকে ধ্বনিত করিয়া সভায় সমবেত হয়। সোনামুড়া ও বিশালগড়েব হিন্দু - মুসলমান সর্দ্দারগণ, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ যে অপূর্ব শৃঙ্খলায় সভা সম্পন্ন করে তাহা যে কোন গণতন্ত্রপ্রিয় ব্যক্তির হৃদয়ে উল্লাস না জাগাইয়া পারে না। বৃদ্ধ বদর আলী মাষ্টার, লাখি আহম্মদ চৌধুরী, আনুমিঞা চৌধুরী, তরুণ মমতাজ আহাম্মদ আর গোপাল ঠাকুর হইতে প্রতিটি পার্বত্য নেতা, নবীন ও প্রাচীন একবাক্যে বলিয়াছে — " আর আমরা পশ্চাতে থাকিব না, আমরা জাগিয়াছি, আমরা একতা বদ্ধ হইয়াছি, আমাদের মধ্যে সংহতি আসিয়াছে।" (সংবাদ সূত্র — ত্রিপুরা রাজ্যের কথা ১ম বর্ষ ৩০শ সংখ্যা, ১৯৪৭ ইং সম্পাদক — বীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত)।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কাকড়াবন প্রজা মজলিস সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহম্মদের সংহতিমূলক ভাষণ - — " এই ভাবেই আমাদের একতাবদ্ধ হইতে হইবে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবার জন্য। এ রাজ্যবাসী শুধু মুসলমান প্রজা সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই চলিবে না, জাতি -ধর্মনির্ব্বিশেষে সকল প্রজারই একতাবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি দরদ প্রদর্শন না করিলে, একদল অন্যদলের প্রতি প্রীতির ভাব প্রদর্শন করিতে না পারিলে, বৃহত্তর স্বার্থের কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে না পারিলে, এবং এক নেতৃত্বাধীনে না আসিলে শান্তি স্থাপন হইবে না, আমরা সম্পদশালী 'ত্রিপুরা ভূমি গঠন করিতে পারিব না।" (সংবাদ সূত্রঃ- অভ্যুদয় ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৯৪৭ ইং সম্পাদক — অজিত বন্ধু দেববর্মণ ও হৃষীকেশ দেববর্মণ)।

এবার আমাদের ত্রিপুরা রবীন্দ্রপরিষদের বর্তমান সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ঠাকুর ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ বাহাদুর সেদিন ত্রিপুরার সংস্কৃতিগত মিলন ও সংহতি সম্পর্কে তার মতবাদ কি ছিল — তারই বিবরণ পুরাণ পত্রিকা থেকে দিচ্ছি ঃ— " ত্রিপুরার সংস্কৃতি পরোক্ষভাবে বাংলার সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট। ইহার প্রধান কারণ বাংলাভাষা আমাদের উচ্চতর ভাবপ্রকাশের একমাত্র অবলম্বন এবং ত্রিপুরা বাংলারই একটি অংশ বলে। বর্তমান স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজস্ব ধারা রক্ষার্থে বৃহত্তর ধারার মধ্যে সীমারেখা টানা ভয় আছে। আমাদের নিকটতম প্রবাহমান উচ্চ বঙ্গ সাহিত্য ধারার সহিত মিলিত হয়ে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে আরো দৃঢ় ও সুন্দর রূপে সৃষ্টি করতে পারব। ইহা আজ সর্ব্বজনবিদিত যে, জাতিব সভ্যতাকে ক্রমাগত সঙ্কীর্ণ সীমা টেনে উৎকর্ষতা লাভ করা যায় না উপরন্তু অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান - প্রদানে ও মিশ্রণে ইহা সম্ভব।"

(সংবাদ সূত্র অভ্যুদয় ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৯৪৭ ইং সম্পাদক অজিতবন্ধু দেববর্মা)।

" এই রাজ্যে মাঝে মাঝে বাঙ্গালী বিদ্বেষের কথা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালী বিদ্বেষ অর্থ এই নয় যে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির উপরই ত্রিপুরীদের কোন বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে। ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টে কোন কোন বাঙ্গালী কর্মচারীদের অপকার্যের দ্বাবা নিজসমাজের ও এই রাজ্যের কলঙ্ক ও ক্ষতিসাধন যারা কবেছে বাঙ্গালী বিদ্বেষ শব্দটি বোধ হয় তাদের প্রতিই আরোপিত হয়। এই রাজ্যে এমন বাঙ্গালীর পরিচয়ও পাওয়া যায় যাবা এই রাজ্যকে ত্রিপুবাদেব মতই ভালবাসে এবং ইহাব সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করে। এই রাজ্যে অন্যদের মত বাঙ্গালীদেরও বাস করতে হবে এবং নিজেদের ও দেশের কল্যাণের জন্য অন্যসম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তারা যেন এই দেশকে বিদেশ মনে করে নিজেদের স্বার্থের জন্য রাজ্যবাসী অন্যদের কেবল শোষণের কথাই চিন্তা না কবে। রাজ্যের ভাল - মন্দের ফলাফল তাদেরও অংশ গ্রহণ করতে হবে।" (সংবাদ সূত্র — ত্রিপুরাদের সমস্যাই ত্রিপুরার প্রধান সমস্যা --- ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, অভ্যুদয় — ১ম বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৯৪৭ ইং)।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবব বাজ্য পুনর্গঠিন কমিশন ত্রিপুরাকে আসাদেব অন্তর্ভুক্ত কবার স্বপক্ষে রায় দেন। এই রায় ত্রিপুরার জনগণের নিকট পৌঁছলে সবাই একত্রে প্রতিবাদ জানায়। এবং সর্ব্বদলীয় সংহতির মাধ্যমে হরতালের ডাক দেয। ত্রিপুবাকে অন্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কবার বিরুদ্ধে এবং স্বতন্ত্র ত্রিপুরার দাবীতে ত্রিপুরার 'গণ' আন্দোলন এবং সর্ব্বদলীয় সংহতি চেতনাই সেদিন ত্রিপুরাকে অন্য-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়নি। সংবাদপত্র থেকে জানতে পারি ঃ—

" আসামের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনায় ত্রিপুরার সকল দলমতের মানুয ইতিমধ্যেই যে ভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে শুরু কবিয়াছেন। অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবোধ গড়িয়া তুলিবাব জন্য এবং পূর্ণ - গণতান্ত্রিক শাসনসহ স্বতন্ত্র ত্রিপুরার জন্য ব্যাপকতম আন্দোলনে যেভাবে অগ্রসর হইয়াছেন এই সভা তাহার জন্যে তাহাদের অভিনন্দন জানাইতেছে।

ত্রিপুরার লক্ষলক্ষ সংগ্রামী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া এইসভা দৃঢ়সঙ্কল্প ঘোষণা করিতেছে -- যতদিন পর্যন্ত ত্রিপুরাকে অন্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পরিত্যক্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর ত্রিপুরাবাসীকে এই দাবীর পিছনে ঐকবদ্ধ করিয়া ব্যাপকতম গণ - আন্দোলন চালাইয়া

যাইতে হইবে।" (সংবাদ সূত্র -- স্বতন্ত্র ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ ই অক্টোবব ১৯৫৫ ইং)।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাবত সংঘর্ষ সংঘটিত হয। সে সময সাবা ভাবতেব জন-মানসে যে সংহতি চেতনাব প্রকাশ দেখা গিযেছিল -- তাবই স্বতঃস্ফুর্ত্ত প্রকাশ ত্রিপুবাব জন-মানসেও দেখা দেয। তাবই পবিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুবাব জনগণেব উদ্দেশ্যে সংহতিব স্বপক্ষে ত্রিপুব সংহতি পত্রিকাব সম্পাদকীযতে লেখা হল --

"চীনভাবত যুদ্ধ যেমন একদিক দিযে অত্যন্ত উদ্বেগ জনক ও অত্যন্ত আশঙ্কাপূর্ণ, তেমনি এ যুদ্ধ আশীর্ব্বাদ স্বরূপও হযেছে নানাদিক দিযে। সাবাদেশে সংহতিব জন্যে নানা ভাবে বহু প্রচেষ্টা কবেও যা সম্ভব হযনি, চীনেব আক্রমণে তা সম্ভব হযেছে। সাবাদেশে তাব নীচতা ও ক্ষুদ্রতা ভুলে গিযে একতাবদ্ধ হযে দাঁড়িযেছে চীনেব এই আক্রমণেব মোকাবিলা কবতে। আজ মানুয তাব ভাষাব দ্বন্দ ভুলেছে, ভুলেছে তাব সামাজিক উচ্চতা - নীচতা। ধর্মেব অন্ধ - গোঁড়ামি এই একতাব নিকট মাথা নত কবেছে, বাজনৈতিক মন - কষাকষি, দব-কষাকষি আজ আব বড হযে দাঁড়াতে পাবছে না। ধনী -দবিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত - বঞ্চিত সকলে এসে একত্রে দাঁড়িযেছে। এই যে সাবা দেশে এক অভুতপূর্ব জাগৃতি তাই দেশেব আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। (সংবাদ সূত্র ত্রিপুব সংহতি ২য বর্ষ, ২১ সংখ্যা ১৯৬৩ ইং)। এব পববর্তী অধ্যাযে পাক ভাবত যুদ্ধ (১৯৬৫খৃঃ) বাংলাদেশেব মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১ ইং) ও ১৯৮০ ত্রিপুবায জুনেব হাঙ্গামা প্রভৃতিব পবিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুবাব পত্র -পত্রিকাব ক্ষেত্রে সংহতিব ভূমিকা সম্পর্কে এখানকাব সবাই পবিচিত। এবং একথাও সত্যি সেদিন ত্রিপুবাব সমস্ত পত্রিকাই কম- বেশী সংহতিব স্বপক্ষে তাদেব সম্পাদকীযতে লিখেছেন -- বিশেষ কবে জুনেব সাম্প্রদাযিক হাঙ্গামাকে কেন্দ্র কবে।

মুসলমান আমলে বাংলা ও ত্রিপুরার রাজনৈতিক সম্পর্ক

বাংলাদেশে মুসলমান শাসনাধিকার দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার রাজনৈতিক সম্পর্কের রূপান্তর ঘটতে থাকে। এবং বিভিন্ন সময়ে তা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়।

কীর্ত্তিধর বা ছেংথুমফা'র রাজত্বকালে মুসলমান শাসকদের পক্ষে প্রথম ত্রিপুরা আক্রমণ করেন হীরাবন্ত খাঁ নামে এক ব্যক্তি যিনি বঙ্গেশ্বরের সামন্ত বলে কথিত। হীরাবন্ত ত্রিপুররাজা ছেংথুমফাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় তিনি হীরাবন্তের বিরুদ্ধে তিনজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে হীরাবন্ত পরাজিত হয়ে গৌরেশ্বরের শরণাপন্ন হন। তখন গৌরেশ্বর ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ছেংথুমফা গৌরেশ্বরের অধিক সৈন্য দেখে ভীত হয়ে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করে যখন সন্ধি করতে উদ্যত হলেন তখন তাঁর বীর রাণী সে ইচ্ছা থেকে রাজাকে নিরস্ত করলেন। এবং স্বয়ং গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। যুদ্ধে গৌড়েশ্বর ছেংথুম্ফার রাণীর নিকট পরাজিত হলেন।

এ বিজয়িনীর নাম রাজমালাতে নেই। কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও দীনেশচন্দ্র সেন দুঃখ করে বলেছেন রাজমালার লেখকও এই বীররাণীর নাম লিপিবদ্ধ করেননি। পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ এই বীররমণীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী ছিল বলে রাজমালাতে উল্লেখ করেছেন।

গৌড়েশ্বরের সঙ্গে ত্রিপুরার সে যুদ্ধ ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। তখন গৌড়েশ্বর কে ছিলেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে সে সময় গৌড়েশ্বর ছিলেন লক্ষ্মণ সেনেব বংশধর সুরাট গ্রামের কোন রাজা।

'যে সময়ে এই যুদ্ধ ত্রিপুরায় হইল
গৌড় দেশে সেন বংশী রাজাগণ ছিল।
(ত্রিপুর বংশাবলী)

পূবর্ববাংলায় তখনও হিন্দুশাসন অক্ষুন্ন ছিল। কেশব সেন অথবা দনৌজ মাধব হয়তো সে সময়ে স্বর্ণগ্রামে রাজত্ব করতেন। তাঁরা সকলেই গৌড়েশ্বরের উপাধি ধারন করেন। কিন্তু সংস্কৃত রাজমালার মত অন্যরূপ। সে গ্রন্থপাঠে জানা যায় সে সময় মুসলমান সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইলিয়জ শাহ(১২১২ ২৭ খৃঃ) পূর্ব্ববঙ্গ ও কামরূপ আক্রমণ করেন। কিন্তু নাসিরুদ্দিন মাহামুদের আক্রমণ সংবাদ পেয়ে ফিরে যান। সম্ভবত ইহাই গৌরাধিপের ত্রিপুরা আক্রমণ ও পরাজয়রূপে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক গৌড়েশ্বরের কথাই বলেছেন ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতীর মালিক তুগ্রল খাঁ জাজনগর আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়েছিলেন। তাঁদের এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হলে তুগ্রল খাঁ ছেংথুম্ফার মহিষীর হাতেই পরজিত হয়েছিলেন এরূপ বলা যেতে পারে। কিন্তু এ বিষয়েও মতান্তর আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন এ জাজনগর উড়িষ্যার রাজধানী জাজপুর মেবার ষ্টুয়ার্ট উড়িষ্যাধিপতি কর্ত্তৃক তুগলখাঁর পরাজয়ের কথা বলেছেন। হান্টার সাহেব ষ্টুয়ার্টের মত সমথর্ন করেছেন এবং কৈলাস সিংহ মহাশয়ও প্রথমে এ মত সমর্থন করেছিলেন। কোন গ্রন্থেই বিজিত

গৌড়েশ্বরের নাম নেই । 'ত্রিপুর বংশাবলীতে ' যুদ্ধের সময় ৬৫০ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১২৪০ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত হয়েছে । ' ত্রিপুর বংশাবলীর' মতে বঙ্গের সেনবংশীয় কোন রাজার সহিত যুদ্ধ হয়েছিল। মহম্মদ ঘোরির সেনাপতি মহম্মদ বখ্‌খিয়ার খিলজী ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মন সেনকে পারজিত করে বঙ্গদেশে পাঠানরাজত্ব স্থাপন করেন । মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজান - ই - সিরাজ " তাখাৎ - ই - নাসেরী" গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনেব উপর পলায়নজনিত কলঙ্ক আরোপ করেছেন । তা সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু বখতিয়ার কর্ত্তৃক বাংলাদেশ বিজয়ের কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন ।

গৌড়ের সহিত ত্রিপুরাব যুদ্ধ ১২৪০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা । যদি এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ১২০০ খৃষ্টাবে, মুসলমানদের বঙ্গবিজযেব কথা না হয়, তা হলে লক্ষ্মন সেনের শাসনকাল ত্রিপুরা যুদ্ধের পূর্বেই শেষ হয়েছে । সে সময় ১২৮০ খৃঃ দনৌজমাধব সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ।তাই কারো কারো মতে ত্রিপুরা আক্রমণ করে মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়েছিলেন । কিন্তু কৈলাসচন্দ্র সিংহ শেষ সিদ্ধান্ত হিসাবে বলেছিলেন — "পাল অথবা সেন রাজাগণের বাঙ্গলা শাসনকালে, কিংবা মুসলমানদিগের লক্ষ্মণাবতী অধিকাবের পব উল্লিখিত যুদ্ধঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন । ১১৫৫ শকাব্দে (১২৩৪খৃঃ) লক্ষ্মণাবতীর আলিখ্য ইজামুদ্দিন আবুল ফতে তুগুল (তুন্ডপল) খাঁ জাজনগর আক্রমন করে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন । কোন কোন ইতিহাস লেখক এ জাজনগরকে ত্রিপুরা নির্ণয় কবেছেন । এ সিদ্ধান্ত সত্য হলে তুন্ডুল খাঁ ছেংথুমফার মহিষী দ্বারা পরাজিত বলে লেখা যেতে পারে"

ত্রিপুরা সিংহাসনে রাজাফা অধিষ্ঠিত তখন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নফা জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিতাড়িত করে সিংহাসন লাভ করতে মনস্থ করলেন। এবং লক্ষ্মণাবতীর মালিক তুগ্রল খার শবণাপন্ন হলেন । তুগ্রল ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ কবে রত্নফাকে সিংহাসন লাভে সহাযতা কবলেন । প্রতিদানে রত্নফা তুগ্রলকে একটি মহামূল্য মাণিক উপহাব দেন । সে মাণিক্যের সন্মানে তুগ্রল খাঁ রত্নফাকে মাণিক্য উপাধি প্রদান কবলেন। সে অবধি ত্রিপুবা বাজপবিবাবে উপাধি মাণিক্য বাহাদুর। রত্নফাই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ।

মুসলমান ঐতিহাসিকবা তুগ্রল কর্ত্তৃক রত্নফাকে যুদ্ধে সাহায্যের ঘটনাকে তুগ্রলখাঁর ত্রিপুরা বিজয় বলে উল্লখ করেছেন । জমিরখাঁর গড়ে এযুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধ জয় করে রত্নফা রাঙ্গামাটি অধিকার করলেন । রত্নফা গৌড়েশ্ববের সাহায্যে ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করেছেন । গৌরেশ্বর সম্পর্কে ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহোদয়েব মত বলে " সম্ভবতঃ সিকান্দরশাহই এই গৌড়েশ্বর । গিয়াসউদ্দিন বারবন" তার কথা ফিরোজশাহ গ্রন্থ হতে জানা যায় যে তুঘবল অনেক সাহসিক কঠিন কর্ম্ম করিয়াছেন। " তারিখই মুবারকশাহী " গ্রন্থে লিখিত আছে যে তুঘরল সোনার গাঁওয়ের নিকট একটি বিরাট দুর্ভেদ্য দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করেছিলেন, তাহা " কিসেন তুঘরল " নামে পরিচিত ছিল । এদুর্গ সম্ভবতঃ ঢাকার পচিশ মাইল দক্ষিণে নারফিলা (লারিকল) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল । তুঘরল যে পূর্ব্ববঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মুসলিমরাজত্ব বিস্তার করেছিলেন , তাতে কোন সন্দেহ নেই । রাজমালায় বর্ণিত ' তুরস্ক নৃপতি'ই তুঘরল বলে অনেকের মত'।

মহারাজা রত্নমাণিক্যের সময়েই ত্রিপুরার সহিত মুসলমানদের সংস্রব আরম্ভ হয় । এজন্য সে সময় ত্রিপুরায় পার্শি ও বাংলাভাযায রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হত । মিঃ মার্শম্যান তাঁর রচিত ইতিহাসে লিখেছেন-

গৌড়ের শাসনকর্ত্তা গিয়াসউদ্দিন ত্রিপুরার রাজার নিকট কর আদায় করেছিলেন কিন্তু রাজমালায় তার কোন উল্লেখ নেই।

· রত্নমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপমাণিক্য ত্রিপুরার সংহাসনে উপবিষ্ট হন । সে সময় বঙ্গদেশ (সমতট) মুসলমানদের অধিকারে (১৩২৩খৃঃ) মুসলমানগণ ১৩৩৮ খৃঃ সুবর্ণগ্রামে রাজ্য স্থাপন করেন এবং মালিক ফকিরুদ্দিন "সুলতান সেকান্দর" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বাঙ্গলায় স্বাধীন পতাকা তোলেন এবং সুবর্ণ গ্রামে রাজসিংহাসন স্থাপন করেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার পাঠান সুলতান সামস্উদ্দিন আবুল মোজাফর ইলিয়াসাহ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। তিনি মহারাজ প্রতাপমাণিক্যকে পরাজিত করেন।

রত্নমাণিক্য ও ধর্মমাণিক্যের রাজত্বের মধ্যবর্তী সময়কালে বাংলার সুলতানগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করে এর কতকাংশ অধিকার করেন। শামসুদ্দিন ফিরোজশাহ (১৩০১-২২খৃঃ) ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট সে সময় জয় করেছিলেন । ফকরুদ্দিন মুবারকশাহ চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন । শামসুদ্দিন ইলিয়াসশাহ (১৩৪২-৫৮খৃঃ) সোনারগাঁও ও কামরূপ জয় করেন। ত্রিপুরার কতকাংশ জালালুদ্দিন মহম্মদ সাহেব(১৪১৮-৩৩খৃঃ) রাজ্যভুক্ত হয়েছিল । পরবর্ত্তীকালে ধর্মমাণিক্য ত্রিপুরার বিজিতাংশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন । ধর্মমাণিক্যর পরে ত্রিপুরার সিংহাসনে ধন্যমাণিক্য অধিষ্ঠিত হন।

চট্টগ্রামের আধিপত্য নিয়ে ধন্য মাণিক্যের সঙ্গে হুসেন শাহের যুদ্ধ হয়েছিল । হুসেনশাহ ধন্যমাণিক্যের বিরুদ্ধে সেনাপতি গৌড়মল্লিককে প্রেরণ করেছিলেন । কুমিল্লা নগরীতে গৌড়মল্লিকের সহিত ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি (রায় কাচাগ) এর প্রথম যুদ্ধ হয় । যুদ্ধে ত্রিপুরা সৈন্য পরাজিত হয় । এদের গতিপথ রোধ করতে রায় কাচাগ গোমতীর নদীতে বাঁধ দিয়ে জলস্রোত আবদ্ধ করেছিলেন । মুসলমান সৈন্য যখন গোমতী জলশূন্যভেবে অতিক্রম করছিল তখন রায় কাচাগ গোমতীর সৈন্য চন্ডীগড় দুর্গে আশ্রয় নিল। বাকী সৈন্যগণ ফিরেগিয়ে হুসেন শাহের নিকট পরাজয়বার্তা প্রদান করল । তখন হুসেনশাহ হৈতন খাঁ নামক সামরিক ব্যক্তিকে রাঙ্গামাটি জয় করবার জন্য প্রেরণ করেন । কুমিল্লার নিকট পুনরায় উভয় দলের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে এবারও রায় কাচাগ পূর্ব্বের কৌশল অবলম্বনে মুসলমান সৈন্যদের নদীর স্রোতে ভাসালেন । হৈতন খাঁ স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন । হুসেনশাহ তৃতীয়বার ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। তিনি কুমিল্লার পরিবর্তে রাজধানী কৈলারগড় (আধুনিক কস্‌বা) অভিমুখে গমন করেন। এযুদ্ধে সম্ভবতঃ হুসেন শাহ ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করেন। হুসেনশাহের ত্রিপুরা আক্রমণের বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে । হুসেনশাহ সম্পর্কে রাজমালায় যে বিবরণ আছে তাতে দেখা যায় মহারাজ ধন্যমাণিক্য ১৪৩৫ সনে (১৫১৩খৃঃ) সেনাপতি রায় কাচাগকে (কয়চাগ) সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম আক্রমণ করে তা দখল করেন । ' কামরূপ কোপত্য বিজয়ী' হোসেনশাহ এ পরাজয়বার্তা শুনে গোড়াইমল্লিককে পাঠান এবং গোড়াইমল্লিক ত্রিপুরা জয় করেন । সে কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে । তারপর ত্রিপুরার সেনা পাঠানোর কালে দু'বার পাঠান সৈন্যদের ডুবিয়ে মারা হয় এবং ধন্যমাণিক্য পুনরায় গৌড়সৈন্য বিতাড়ণ করেন।

হোসেন শাহ পুনরায় ১৪৩৭ শক (১৫১৫খৃঃ) হৈতন খাঁ ও করাখাঁ নামক সেনাপতিদ্বয়কে ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য পাঠান। পাঠান সৈন্য গোমতীর পথে (কুমিল্লা হয়ে) না এসে সরাইল কৈলারগড় (কসবা) ও বিশালগড়ের পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং ডোমমাটির পথে শিবির সন্নিবেশ করে রাজধানী

রাঙ্গামাটি (উদয়পুর) আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে । এবারও ত্রিপুরা সৈন্য কৌশলে গোমতীর বাঁধ ভেঙ্গে জলে ডুবিয়ে পাঠান সৈন্য নিহত করে।

উপরোক্ত আক্রমণ ছাড়া রাজমালায় হোসেন শাহের আর কোন আক্রমণের কথা উল্লেখ নেই । রাজমালার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় । ও ত্রিপুরার ঐতিহাসিক কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় স্বীকার করেছেন যে হোসেনশাহ কর্ত্তৃক তৃতীয়বার ত্রিপুরা আক্রান্ত হয়েছিল । কৈলাশ সিংহ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন – "কৈলারগড় সন্নিকটে হোসেনশাহের সহিত মহারাজ ধন্যমাণিক্যের যে সংগ্রাম হইয়াছিল রাজমালা লেখক তা উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় ইহার পরিণাম ত্রিপুরেশ্বরের পক্ষে বিশেষ গৌরব জনক হয় নাই । এ জন্যই রাজমালা লেখক তাহা গোপন করিয়াছেন ।" কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ লিখেছেন "তৃতীয়বারের যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর পরাস্ত হইয়া থাকিলেও তাহার জন্য ত্রিপুরার বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নাই এবং যে সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা উদ্ধার করিতে অধিক বিলম্ব ঘটে নাই।"

হোসেন শাহের তৃতীয় আক্রমণ কৈলারগড়ের (জাজিনগর বা কস্‌বা) উপর এক -তৃতীয়ংশ আক্রমণের সত্যতা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা (কৈলাস সিংহ ও কালীপ্রসন্ন সেন সুর্বণ গ্রামের শিলালিপির কথা উল্লেখ করেছেন। যে শিলালিপিখানা কানিংহাম সাহেব আবিষ্কার করেন তাতে লিখিতছিল "৯১৯ হিজরার রবিউস সানি মাসের দ্বিতীয় দিবসে (৭ই জুন ১৫১২ খৃঃ) ত্রিপুরার শাসনকর্ত্তা ও হর্ক্লিষ ময়জুমাবাদের উজির খাওয়াস খাঁ কর্ত্তৃক এ মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়েছিল ।" বেঙ্গল রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এ শিলালিপিব তারিখ ৭-৬ - ১৫১৩খৃঃ লেখা হয়েছেন । কৈলাস সিংহ এ শিলালিপিকে ১৪৩৫ শকাব্দের বলে উল্লেখ করেছে, (১৪৩৫ + ৭৪ = ১৫১৩ খৃঃ) কিন্তু কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ এ শিলালিপিকে ৯১৯ হিজ্‌রী (১৪২২ শাক) বলে বাঙ্গালার ইতিহাসে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন এবং ফুটনোটে ১৫০ খৃঃ) লিখেছেন । ৯১৯ হিজরা ১৫০১ খৃঃ হতে পারে না । এটা ১৫১২ –১৩ খৃঃ হবে, হয়তো তিনি হিজরী সনকে শকাব্দে পরিণত করতে অথবা হিজরী সনকে খৃষ্টাব্দে পরিণত করতে ভুল করেছেন । (১৪২২ +৭৮ =১৫০০। পূর্ব্বে উল্লেখিত হয়েছে যে হোসেন শাহের সঙ্গে মহারাজা ধন্যমাণিক্যের প্রথম সংঘর্ষ হয় চট্টগ্রামে ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১২– ১৩খৃঃ) হোসেনশাহ সে যুদ্ধে পরাজিত হন বলে কুমিল্লা দিয়ে পুনরায় আক্রমণ করেন। সুবর্ণগ্রামের শিলালিপিরদ্বারা বোঝা যায় যে ১৫১৩খৃঃপূর্ব্বে হোসেন শাহ ত্রিপুবার পশ্চিমাংশ অধিকার করে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ কবেছিলেন । কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে (এ শিলালিপির দ্বারা) - চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার (কুমিল্লা) দিকে হোসেন শাহ ১৫৩ খৃঃ পূর্ব্বেই দখল করে ফেলেন ।

কৈলাশ সিংহ লিখিত সিলেটের ১১ হিজরার ১৪২৭ শকাব্দের শিলালিপির উল্লেখ করে বলতে চান যে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের (১৪২৭ + ৭৮খৃঃ) পূর্ব্বে হোসেনশাহ ত্রিপুরা ভূমি অধিকার করে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করতে পারেননি। কারণ খালিশ খাঁকে উক্ত শিলালিপিতে ময়জ্জমাবাদের উজীর বলা হযেছে। তাতে ত্রিপুরা ভূমির উল্লেখ নেই । কিন্তু ৯১৯ হিজারার (১৫১৩খৃঃ) শিলালিপিতে তাকে (খালিশ থাকে) মোয়াজ্জমাবাদ ও ত্রিপুরা ভূমির শাসনকর্ত্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে । অতএব হোসেন সাহ ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের পরে ত্রিপুরা অধিকার করে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। এই শিলালিপিদ্বয় ঘোষণা করে

যে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের পরে এবং ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যে হোসেন শাহের শাসন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

' ত্রিপুরার রাজদরবারের লিখিত ইতিহাস রাজমালা ত্রিপুরা রাজ্যের পরাজয় কাহিনী উল্লেখ করেনি । হোসেন শাহের তৃতীয় আক্রমণের কথা উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খা ও তার পুত্র ছুটি খাঁর বিজয়কাহিনী রাজমালায় নেই অথচ পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিনাংশে ফেনীনদীর পূর্ব্বস্থিত চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুর স্থানে রাজধানী স্থপন করে সুখ্যাতির সহিত রাজত্ব করেছেন।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহের সঙ্গে ত্রিপুররাজ ধন্যমাণিক্যের যুদ্ধেরপর বিজয়ী হোসেনশাহ ত্রিপুরার পশ্চিমভাগে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেছিলেন। হোসেনশাহ পরাগলপুরের দিক হতে ত্রিপুরাকে আক্রমণ করেছিলেন ।এ অভিযান পরাগল খাঁ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়েছিল । পরাগল খাঁ বিজয়ী হয়ে সে স্থানের শাসনকর্তা হোসেনশাহ্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হলেন। ত্রিপুররাজ তাকে হটাতে পরেননি ।এজন্যই রাজমালায় পবাগল খাঁ ও ছুটি খাঁনের কোন উল্লেখ নেই ।

রজননীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৌড়ের ইতিহাসে লিখিত আছে " রাস্তি খানেব পুত্র পরাগল খাঁ হোসেনশার একজন সেনাপতি ছিলেন ।"

পরাগল খানের সভা কবি রবীন্দ্র তার কাব্যে লিখেছেন ঃ--

রাস্তি খান তনয় যাহল গুণনিধি
পৃথিবীতে কল্পতরু নিরমিল বিধি
সুলতান হুসেন পঞ্চম গৌড়নাথ
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল যার হাত ।।

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র ছুটি খাঁ ত্রিপুবেশ্বরের পরাক্রম হ্রাসের জন্য নিযোজিত হয়েছিলেন।

পরবর্ত্তীকালে বিজয়মাণিক্য মগ ও মুসলমানদের জয় করে চট্টগ্রাম উদ্ধাব করেন। সে সময় করবান্য বংশীয় উড়িষ্যাবিজয়ী সুলতান সুলেমান চট্টগ্রাম অধিকার করবার জন্য সেনাপতি মহম্মদ খাঁকে আদেশ করলেন। চ ট্টগ্রামে ত্রিপুর সৈন্যের সঙ্গে মুসলমান সৈন্যের আটমাস ব্যাপী যুদ্ধ হল । প্রথম ত্রিপুরার সেনাপতি নিহত হন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের পরাজয ঘটে।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে অমরমাণিক্যের বাজত্বকালে বাংলার শাসনকর্ত্তা শেখ ইস্‌লাম খাঁ ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করে ত্রিপুরা অভিযান মানসে ত্রিপুরারাজ্য আক্রমণ করলেন । অমর মাণিক্য সেনাপতি ঈশা খাঁকে ইস্‌লাম খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন । ইস্‌লাম খাঁ ঈশা খাঁর হাতে পবাজিত হয়েছিলেন।

১৬২৫ খৃষ্টাব্দে কল্যাণ মাণিক্যের শাসনকালে বাঙ্গালার শাসনকর্তা সুজা ত্রিপুবা জয়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করলেন । কিন্তু কল্যাণ মাণিক্যের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে ত্রিপুরা পরিত্যাগ করলেন।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে কল্যাণ মাণিক্যের শাসনকালে বাঙ্গালার শাসনকর্তা সুজা ত্রিপুরা জয়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা কবলেন কিন্তু কল্যান মাণিক্যের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে ত্রিপুরা পরিত্যাগ করলেন।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণক্যের সময়ে ঢাকার দেওয়ান মীর হাবিব জগৎরাম ঠাকুরকে সঙ্গী করে ত্রিপুরায় আস্লেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা মুজাউদ্দিনের অনুমতি নিয়ে মীর হাবিব ত্রিপুরা আক্রমণ করলেন। কুমিল্লার নিকট এ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মীর হাবিবের নিকট ত্রিপুররাজ ধর্মমাণিক্যের পরাজয় হয়েছিল। নবাব মুজাউদ্দিন ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রকে ' চাকলা রোশনাবাদ' আখ্যা দিয়ে বার্ষিক ৯২৯৯৩ টাকা কর ধার্য্য পূর্ব্বক জগৎমাণিক্যকে জমিদারীস্বরূপ প্রদান করলেন।

আলিবর্দ্দির সময়ে যখন ত্রিপুরার সিংহাসন জয়মাণিক্য বিজয়মাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্য তিন জনেই একসঙ্গে ত্রিপুরার সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টা করতে ছিলেন-- সে সময় দক্ষিণ সিক পরগনার সমসের গাজী ঢাকার হাজি হোসেনের সহযোগে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন এবং ত্রিপুরা জয় করেন। সমসের গাজি একাধারে ত্রিপুরার সিংহাসনে সাত বৎসর অধিষ্ঠিত থেকে ত্রিপুরা শাসন করেছিলেন। সমসের গাজির সময়ে ভারতে ইংরাজদের আধিপত্য পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে আসে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় প্রথম ইংরাজ পতাকা উড্ডীন হয়। ভারতে মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটেছিল যদিও আরও অনেক পূর্ব্বেই কিন্তু স্বাধীন ত্রিপুরা ইংরেজদের নিকট ও অধিনতা স্বীকার করতে হয় নাই। যদিও বাঙ্গলার মুসলমান শাসনকর্তারা সময় সময় ত্রিপুরা জয় করেছিলেন কিন্তু কেহই এখানে সুদীর্ঘকালের জন্য রাজ্য বিস্তার ও শাসন করতে পারেননি। সীমিত সময়ের জন্যই অধিকাংশ মুসলমান শাসনকর্তাই ত্রিপুরা শাসন করেছিলেন।

বৃহত্তর ত্রিপুরার নাথপন্থীদের ইতিহাস

নাথধর্ম ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার । নাথধর্ম নাথ উপাধিকারী যোগী জাতির মধ্যে একদা উদ্ভুত হয়ে সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল । সে যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের কঙ্কাল স্বরূপ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম দারুণ ব্যধির ন্যায় ভারতের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল । সে যুগে শৈব হিন্দু ধর্ম্ম ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করে এর বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়েছিল। সে ঘোর ধর্ম্ম কলহের দিনে । (১০ম ১১শ শতাব্দীতে) নাথধর্ম্ম আর্বিভূত হয়ে কলহ পরায়ণ ধর্মদ্বয়ের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করেছিল।

বাংলাদেশে এককালে নাথধর্মের খুব প্রভাব ছিল । গোরক্ষনাথ বাংলায় নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন । আর মৎস্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মে নাথধর্মের প্রবর্ত্তন করেন। তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নাথধর্ম বাংলায় প্রবর্তিত হয়েছিল । এবং দশম - একাদশ অব্দে বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছিল।

বৃহত্তর ত্রিপুরায় নবম ও দশম শতাব্দীতে নাথপন্থীদের প্রভাব দেখা যায় । বিশেষ করে সেদিনকার মেহেরকুল পাটিকারা রাজ্যেই নাথ ভক্তদের প্রধান লীলাকেন্দ্র ছিল । মেহেরকুল প্রাচীন রাজ্য । বর্তমান বাংলা দেশের অর্ন্তগত কুমিল্লা সেদিন মেহেরকুলের অন্তর্গত ছিল । প্রত্নতত্ত্ব হতে আমরা জানতে পারি কুমিল্লার প্রাচীন নাম ' কমলাঙ্গ'। হুয়েন সাঙ্গের বিবরণে 'কমলাঙ্কের' নাম আছে । কমলাঙ্কে সে সময় বৌদ্ধ প্রভাব ছিল । পাটিকারা রাজ্যও সে সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হয়েছিল । 'ময়নামতীর গানে ' তার প্রামাণ বিদ্যমান । পাটিকারা ' কমলাঙ্ক' উভয় রাজ্যই তখন মেহেরকুলের অন্তর্গত । খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মেহেরকুলের তিলকচন্দ্র রাজ্যত্ব করতেন । তিলকচন্দ্রের কন্যার নাম ময়নামতী । মানিকচাঁদ ময়নামতীকে বিবাহ করেন । ময়নামতীর পুত্রের নাম গোপীচাঁদ । গোপীচাঁদের সময়েই ত্রিপুরায় নাথপন্থীদের সুবর্ণ যুগ ।

১১৪১ শকাব্দের একটি তাম্রশাসন হতে জানা যায় রণবঙ্কমল্ল নামে একজন নরপতি কমলাঙ্ক পাটিকারা প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করতেন। ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহোদয় তার ' রাজমালায়, বলেন "মহারাজায়াং' গ্রন্থে উল্লিখিত পাটিকারা রাজবংশেরই জনৈক নরপতি ছিলেন । আধুনিক মেহেরকুল গঙ্গামন্ডল ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানগুলিও রাজবংশের শাসনাধীন ছিল।"

ত্রিপুরা জেলার গণেশপুর গ্রামের শ্রীবৈকুন্ঠনাথ দত্ত মহাশয়ের আবিষ্কৃত এবং ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুন্ঠ নাথ দত্ত সম্পাদিত ভবানীদাসের ভণিতাযুক্ত "ময়নামতীর গান নামক গ্রন্থে আছে চন্দ্র উপনামধেয় এক রাজবংশ সে সময় সমগ্র বঙ্গের উপর আধিপত্য করতেন । মেহেরকুল শহরে (ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহেরকুল পরগণা) তাদের রাজধানী ছিল । রংপুর জেলা হতে ডঃ গ্রীয়ারসন সাহেবের " মানিকচন্দ্র রাজার গান ' সংগৃহীত হলে উত্তর বঙ্গ মানিকচাঁদ ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্র রাজার লীলা-ক্ষেত্র বলে সাব্যস্ত হয় । কিন্তু 'ময়নামতীর গান' ও ' গোর্খা বিজয়' আবিষ্কৃত হবার পর গ্রীয়ারসন প্রমুখ পন্ডিতদের ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে ।

দুর্ল্লভ মল্লিকের ভণিতাযুক্ত " গোবিন্দচন্দ্র" গীতে বা গোপীচাঁদের গীতে দেখি পাটিকানগর গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল । দুর্ল্লভ মল্লিকের ছড়া পূর্বে ত্রিপুরাতে প্রচলিত ছিল। কুমিল্লার পাঁচ মাইল পশ্চিমে লালমাই

পাহাড়ের উত্তরাংশে ময়নামতী পাহাড় অবস্থিত। পরম সিদ্ধা রাণী ময়নামতী এখানে সিদ্ধিলাভ করেন বলে এ স্থানের নাম ময়নামতী হয়। রাণী ময়নামতীর চারটি স্থানে চারটি বাড়ি ছিল। প্রথম বাড়িটি শ্রীহট্ট জেলায়, দ্বিতীয় বাড়ি চট্টগ্রামে, তৃতীয়বাড়ি বিক্রমপুরে এবং চতুর্থবাড়ি ময়নামতীতে। পূর্বেই বলেছি ময়নামতী তিলকচন্দ্রের কন্যা। এই কন্যাকে বাংলার সে সময়কার অধিপতি সুবর্ণচন্দ্রের পৌত্র (শ্রী চন্দ্রদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) মানিকচন্দ্র বিবাহ করেন। রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর " বঙ্গভাষা ও সাহিত্য " গ্রন্থে বলেছেন " মানিকচন্দ্র বিবাহসূত্রে মেহেরকুলের (ত্রিপুরারাজ্যের) উত্তরাধিকারী লাভ করেন এবং পিতৃরাজ্য বিক্রমপুর প্রাপ্ত হইয়া উভয় রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁর রাজ্যধানী পাটিকার এখনও বিদ্যমান। " ত্রিপুরার চতুর্দিকে যে পর্ব্বতমালা দেখতে পাওয়া যায় তাহা ময়নামতী নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সুতরাং তিলকচন্দ্রের কন্যার নামের ইহা চিরস্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ হয়ে আছে। কালক্রমে ময়নামতী পৌঢ় বয়সে পদার্পণ করলেন এবং মানিকচন্দ্র ত্রিপুর রাজগণের বহুবিবাহের চিরন্তন প্রথা পালন করে আরো চারটি প্রধান এবং ১৮০টি সামান্য ভার্য্যা গ্রহণ করলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত চন্দ্রদেবের কথা ইদিলপুর ও রামপালের তাম্রশাসনে দেখা যায়। রামপালের তাম্রশাসনের লিপি অনুসারে পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্রদেব। ইদিলপুরের তাম্রশাসনের লিপি অনুসারে সুবর্ণচন্দ্র, তৈলোক্যচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্রদেব।

ময়নামতীকে বিবাহ করার পর মাণিকচন্দ্র পিতৃরাজ্য বিক্রমপুর এবং শ্বশুরের রাজ্য মেহেরকুল বা পাটিকারায় আধিপত্য লাভ করেছিলেন। দুর্ল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র গীতে আমরা পাই

আরেখ হইল সিদ্ধা খেতির উপর
এক নাম রাখি জায়ে মেহারকুল সহর
আর্দ্ধ (আদ্য) মাটি আছে কিছু মিহারকুল নগরে
নিজ মাটি আছে কিছু বিক্রমপুর সহরে
আর আছে আইধ্যা মাটি তরপের দেশ
চাটি গ্রাম পূবর্ব মাটি জানিক বিশেষ।

এখানে গৌড়,পাটিকারা ,বিক্রমপুর, তরপ ও চট্টগ্রাম। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালির মতে -' তরপের দেশ বোধহয় রঙ্গপুর। শ্রীহট্ট 'তরপ' নামে একটি খন্ডরাজ্য আছে। তথায় চন্দ্র রাজনগরে আধিপত্য বিস্তারের কোন প্রমাণ নাই। " ময়নামতী গানে " উল্লিখিত তরপের অবস্থান নির্ণয় করা বর্তমান কালে দুঃসাধ্য। অপর এক পুস্তকে আছে তিলকচাঁদেব দুইকন্যা - ময়নামতী ও সিন্দুরমতী। এই তিলকচাঁদের রাজবাড়িতে গোরক্ষনাথ নামক এক সিদ্ধযোগীর যাতায়াত ছিল। বালিকা ময়নামতীকে দেখে গোরক্ষনাথ তাকে দীক্ষা দিলেন।

ময়নামতীর স্বামী মানিকচাঁদ সম্পর্কে ডক্টর গ্রীয়ারসন উত্তরবঙ্গের সামন্তরাজ ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে লিখেছেন —

"We thus I think can be certain of the following facts that early in the 14th centuary a king named DharmaPal ruled over a small tract of country near the Koratoya river in the present districts of Rangpur and Jalpaiguri and close to his capital city their lived in a fartified stronghold a Powerful chief named Manikchandra who was marrid to a lady called mayna.

Between the king and the chief acording to local tradition. a war arose which ended in the defeat and disappearance of the former and triumph of the latter in a great battle fought on the Banks of the river 'Hangri gosha The battle field is still shown a mile or so to the north ot the Dharmapur .After this victory Manik chandra took up his residance at Dharmapur "

ডক্টর গ্রিয়ারসন মানিকচাঁদকে রঙ্গপুরে আগন্তুক রাজা হিসাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন। " বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত" গ্রন্থে পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় মানিকচন্দ্র ও ধর্ম্মপালকে সুবর্ণ রাজার পুত্র বলে অভিহিত করেছেন । মানিকচন্দ্রের গানে আছে – " মানিকচাঁদ রাজ্য বঙ্গ বড় সতী" । ময়নামতীর গানে মানিকচন্দ্র রাজার মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধে তাঁর রাজ্যের কথা জানতে পারি। সেখানে আছে –

" আষাঢ় মাসেতে মৈল মানিকচাঁদ গোঁসাই
প্রিথিমিতে জলমত পুরিতে স্থান নাই
সৈত্য যুগে গঙ্গাদেবী গুমুতে আছিল
গোমেদের কুলে বসি কান্দিতে লাগিল
আমার কান্দনে গঙ্গার স্নেহ উপজিল
সমুদ্রের গঙ্গাদেবী ভাসিয়া উঠিল
গঙ্গা বলে ময়নামতী কান্দ কি কারণ
যোড়হস্তে নিবেদিলাম গঙ্গার চরণ
মেহের কুলের রাজা ছিল মানিকচান্দ গোঁসাই
পৃথিবীতে জলমত পুরিতে স্থান নাই ।"

এখানে মানিকচন্দ্রকে মেহেরকুলের রাজা এবং মেহেরকুল গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত বলে স্পষ্টতঃই উল্লেখ করা হয়েছে । বাংলাদেশে একমাত্র ত্রিপুরা জেলাতে মেহেরকুল পরগণা আছে এবং এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ডুম্বুর জলপ্রপাত থেকে সৃষ্ট গোমতী নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল। শিবচন্দ্র শীল মহোদয় সম্পাদিত " গোপীচন্দ্র গীতে" গোবিন্দ্রচন্দ্রের পিতা তার ভূক্তি (ত্রিহুত) বঙ্গাল ও কামরূপের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক শীতল চক্রবর্ত্তী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন - " ময়নামতী যখন পিত্রালয় ছিলেন তখনই তার দীক্ষা হয় । " গোরক্ষনাথের উক্তি হতে মেহেরকুলই যে ময়নামতীর পিত্রালয়ে ছিল তার আভাষ পাওয়া যায় । ময়নামতীর বিবাহের পর মেহেরকুলের অন্ততঃ কুমিল্লার সন্নিহিত অংশ সম্ভবতঃ পাটিকারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইহা তাঁর স্বামী (মানিকচাঁদ) তাঁব পিতার (তিলকচন্দ্র) নিকট হতে যৌতুক স্বরূপ পেয়ে থাকবেন।

" দাদার মিরাশ যাবেক কামলাকনগর " এ উক্তিতে কুমিল্লা দানের সম্পত্তি বলেই বুঝা যায়। মেহেরকুল ও পাটিকারা মেহেরকুলের ঐক্যসাধন দ্বারা মানিকচন্দ্রের মেহেরকুল এবং গোবিন্দচন্দ্রের পাটিকারা যে বৃহত্তর ত্রিপুরায় অবস্থিত ছিল তা নিঃসন্দেহে জানা যায়। পন্ডিত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার তাঁর "জীবনীকোষ" অভিধান গ্রন্থে গোপীচাঁদের সম্পর্কে বলেছেন । বঙ্গদেশে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র, পিতার নাম মানিকচন্দ্র ও মাতার নাম ময়নামতী । গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। চোলবংশীয় দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল তাহাকে পরাস্ত করেছিলেন । কিন্তু বঙ্গদেশীয় গ্রন্থে আছে রাজেন্দ্র চোল গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক পারজিত হয়েছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রের দুই মহিষী আদুণ্য ও পাদুণ্য সাভারের রাজ্য হরিশচন্দ্রের কন্যা ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম মানিকচন্দ্র কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল। মানিকচন্দ্র ত্রিপুরা রাজবংশে বিবাহ করিয়াছিল।"

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী গোপীচাঁদ সম্পর্কে বলেন — " নাথ সাহিত্যের হাড়িপার শিষ্য ষোল বঙ্গ বা ষোলদত্ত বা মেহের কুলের রাজা সর্বভারতীর কীর্তি গোপীচাঁদ বঙ্গালরাজা গোবিন্দচন্দ্রের অভিন্নতা সম্বন্ধে আর বড় সন্দেহ থাকা উচিৎ নহে।" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস সম্পাদকীয়, ৬৮পৃঃ)। অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখ্যোপাধ্যায় বলেন - "মাতার পীড়নে বাধ্য হইয়া গোরক্ষনাথ প্রবর্ত্তিত যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে বাধ্য হন" (জ্ঞানভারতী ,১ম খন্ড ১ম ৩৭৮পৃঃ)।

গোবিন্দচন্দ্র যে মেহেরকুলের রাজা ছিলেন তাহা দুর্ল্লভমল্লিকের পুঁথির কয়েক ছত্র হতেই বুঝা যায় -

" খেনেক রহ বসুমতি খেনেক রহ তুমি
মেহার কুলের রাজারে পরীক্ষা দেখাই আমি।"

রাজা গোবিন্দচন্দ্র একজন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। চল্লিশজন রাজা তাঁকে কর দিত। ময়নামতির পুঁথিতে আছে —

এহি সব এরি জাবে আপনে জানিয়া
নয়ানগর এরি জাবে উনশত বানিয়া
বাপের মিরাশ এরি যাইমু গৈরব সহর
দাদার মিরাশ এরি জাবে কামলাক নগর
তুমি মা এর মত বাড়ি কালিকা নগর
আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর
চল্লিশ রাজা একর দেনাএ আমার গোচর
আমা হতে কোন জন আছে এ ডাঙ্গর।"

ভবানীদাসের কলিকা বা কণিকানগর শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত কৌলীন্য নগর হতে পারে। (সাহিত্য পরিষৎ হতে প্রকাশিত বাঙ্‌লা প্রাচীনপুঁথির বিবরণে ৫১৬ সংখ্যক পুঁথির পরিচয় দ্রষ্টব্য)।

ত্রিপুরা জেলাব নবিনগড়ের নিকটও এক কণিকা নগর বিদ্যমান। নয়ানগর বা নয়ানগড় ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার নিকট নয়ানগর নামে এক গ্রাম আছে। আমাদের মনে 'নয়নগর' ত্রিপুরা জেলার অন্যতম গ্রাম নবিনগর। নবিনগরের সেসময়কার সমৃদ্ধির কথাও উল্লিখিত আছে। এক নবিনগরেই সে সময় ঊনশত জন উল্লেখযোগ্য বণিক ছিল।

রাণী ময়নামতীর ময়নামতী পাহাড়ের বাড়ির চারদিকে ঊনশতটি রাজবাড়ি ছিল। স্থানীয় প্রবাদে আছে যে ৯৯জন চন্দ্রবংশীয় রাজা এখানে রাজত্ব করেছিলেন। আবার কারো কারো মতে রাণী ময়নামতীই নিজবাড়ির চারদিকে এই ঊনশতটি রাজবাড়ি তৈরী করেছিলেন।

স্থানীয় অঞ্চলের জনসাধারণ "ঊনশত রাজার বাটী' বলে এস্থানটিকে অভিহিত করে। অপরমতে আছে যে ময়নামতী ও লালমাই পাহাড়শ্রেণী শালবান বা সলমন রাজ্য, আনন্দরাজা বৌদ্ধ, মানিকচন্দ্র রাজা ও তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র রাজ্য প্রভৃতি বহু সামন্তরাজাগণের লীলাভূমি ছিল। ময়নামতীর নামে ময়নামতীর পাহাড় এবং ময়নামতীব কন্যা লালময়ী বা লালমতীর নামে লালমাই পাহাড়ের নামকরণ হয়। কৈলাস

সিংহ মহোদয়ের প্রণীত রাজমালায় ময়নামতীকে গোপীচাঁদের পত্নী এবং লালময়ীকে তাঁর কন্যা বলে অভিহিত করেছেন। কৈলাস সিংহের এ মতের সমর্থন কোন ঐতিহাসিকই করেননি বা গোপীচাঁদের গানে অথবা ময়নামতীর গানেও উক্তির সপক্ষে কোথাও কিছু নেই।

বর্তমান বাংলাদেশের ত্রিপুরাজেলার কুমিল্লার নিকটে লালমাই রেলষ্টেশন হতে কুমিল্লা সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দশ - এগার মাইল রেলপথের সমান্তরালে লালমাই- ময়নামতী পাহাড়শ্রেণী আছে। ইহা উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১০-১১ মাইন দীর্ঘ। পাহাড়ের উপরের অংশের নাম ময়নামতী এবং দক্ষিণ অংশের নাম লালমাই পাহাড়। লালমাই পাহাড়ের নামানুসারে লালমাই রেলষ্টেশনের নামকরণ হয়েছে। ময়নামতী লালামাই পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থানের কিছু উত্তরে বিস্তৃত সমভূমি আছে। সে স্থানটি এককালে দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত ছোট সহর ছিল বলে অনুমিত হয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে কার্যোপলক্ষে সামরিক পূর্ত্ত বিভাগের লোকেরা এ স্থান খনন কালে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ; বহু ধাতব মুর্ত্তি এবং পট্টিকেরা নামাঙ্কিত মুদ্রা পেয়েছেন। পাহাড়ের সমস্ত পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে আট দশ মাইলখানেক পাটিকারা পরগণা এবং সমগ্র পূর্ব্বদিকটা জুড়ে মেহেরকুল পরগণা সে সময় বর্তমান ছিল। পাটিকারা একদা বিখ্যাত নগর ছিল।

" তোর বাপের ঘর ছিল সঙ্কাছরা মাটি
তাহাতে বিছাইল পুনঃ গঙ্গাজল পাটি
(ময়নামতীর গান)

পাটিকারা নামটি সেখানে উত্তম পাটি প্রস্তুত হত বলেই হয়েছে কারো কারো অনুমিত ধারণা। ধাবিচন্দ্র সে সময় বঙ্গে রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানী পাটিকারা বলে উল্লেখ আছে। বাংলার (পুরাবৃত্ত) পাটিকারা নামের সহিত পাটিশব্দ যোগের অনুমান পাটিকা নামের দ্বারাও সমর্থিত হয়। পাটিকারাজ্য লোপ পেয়ে পরে মেহেরকুলের অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল। মেহেরকুলের শেষ রাজ পাটিকারার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজ্যও শাসন করতেন। রংপুর জেলার " ময়নামতীর কোট " তাঁর নিদর্শন। পাটিকারার অধিকার রংপুর হতে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর গানে ত্রিপুরার কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয় ত্রিপুরার রাজা কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর ঐ সব অঞ্চল ত্রিপুরার অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরার রাজাগণ সমতটের কোন কোন অংশ আধিপত্য বিস্তার করেন।

রাণী ময়নামতীর গুরু ছিলেন শৈবযোগী বা হটযোগী মীননাথের শিষ্য ও মৎস্যেন্দ্রনাথের গুরুভ্রাতা গোরক্ষনাথ। আর রাজা গোবিন্দ্রচন্দ্রের গুরু ছিলো হাড়িফা সিদ্ধা।

গুরু আদিনাথ, গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ গোরক্ষনাথ ও তিনজন নাথগুরুকে তিন নাথ বলা হয়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এদের কৃপায় অমঙ্গল দূর হয়। এঁদের পূজাকে তিন নাথের সেবা বা তিন নাথের মেলা বলা হয়। কাছাড় এবং বর্তমান বাংলা দেশের ময়মনসিংহ,ঢাকা,ত্রিপুরা,শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সন্ধ্যাবেলা সরিষা তৈলের প্রদীপ জ্বালিয়ে পান-সুপারি ও গাঁজা খেয়ে ভক্তবৃন্দ তিন নাথের গান করেন। ত্রিপুরায় অত্যধিক চলতি ত্রিনাথের একটি গান আজও গীত হয়ে থাকে-

' তিন পয়সায় হয় যার মেলা
কলিতে তিন নাথের মেলা
এক পয়সার সিদ্ধি আনি তিন কলকি সাজায়

সাধূরে ভাই কলিতে তিন নাথের মেলা
এক পয়সার পান আনি তিন খিলি সাজায়
সাধুরে ভাই কলিতে তিন নাথের মেলা।
এক পয়সায় তৈল আনি তিন বাতি জ্বালায়
বাতি জ্বালিয়ে দিলে নিভে নারে একিরে আজব লীলা
সাধুরে ভাই কলিতে তিন নাথের মেলা'।

এই তিন নাথের এক নাথ মীননাথ বাঙালী ছিলেন । অধ্যক্ষ শহীদুল্লাহ্ বলেন, "পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ গৌরব যে এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বাঙাল থেকে দেশের নাম হয়েছে বাঙলা বা বাংলা। পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে এই দেশ থেকেই বাংলা সাহিত্য ও নাথপন্থের উৎপত্তি হয়েছে । মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন বাংলার আদিলেখক, তেমনি তিনি নাথ গ্রন্থের প্রবর্ত্তক। তার নিবাস ছিল ক্ষীরোদসাগরের তীরে চন্দ্রদ্বীপে , বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ যাকে সন্দীপ বলে।"(আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৭শ বর্ষ, ২৮৬ সংখ্যা, ২৩শে পৌষ, ১৩৫৫ বাং) ।" "নিত্যাহ্নিক তিলকে "(লিপিকাল ১৩৯৫ খৃষ্টব্দ) লেখা আছে মৎসোন্দ্রনাথের ' বরণাবঙ্গি দেশে ' জন্ম । কোর্ডিয়ার সাহেব তার প্রকাশিত তন্ত্রের তালিকায মৎস্যেন্দ্র নাথকে বাঙালী বলেছেন ।(ক) পরিশিষ্ট ৮১১ পৃঃ) । উইলসন সাহেবের মতে মৎস্যেন্দ্র নাথ বঙ্গের উত্তর বা পূর্ব্ব অংশের লোক । মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার 'বাঙ্গালার প্রাচীন গৌরব ' প্রবন্ধে বলেন ' নাথেরা যে বাংলাদেশের বা পূর্ব ভারতের লোক তাহার স্পষ্ট প্রামাণ মীননাথের একটি পদে পাইয়াছি, সেটি খাঁটি বাংলা ।ডাঃ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ একাধারে বাংলার লোক।' মৎস্যেন্দ্র নাথ বরিশালের চেদোর লোক।(প্রবাসী - ফালগুন চৈত্র, ১৩২৮ বাংলা)। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে 'নাথ পন্থের প্রসার হয়েছিল যে বাংলাদেশ থেকেই তার বলবৎ প্রমাণ আছে । বাঙলার বাহিরে মীননাথ মৎস্যেন্দ্রনাথ নামেই পরিচিত ।নাম দুটি সমার্থক ।মৎস্যেন্দ্র 'পরিণত হয়েছে মছীন্দরে।' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার ৫ম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ)।তিনি বলেছেন- মীননাথ যে চন্দ্রদ্বীপের লোক সে সমন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে ।তার প্রধান কর্মক্ষেত্র ময়নামতীতে ছিল। ময়নামতী নাথ সিদ্ধাদের প্রিয় স্থান ছিল।

তিন নাথের অপর আর এক নাথ গোরক্ষনাথ 'Gorak nath and Midiaval Hindu Mysticism' নামক গ্রন্থে গোরক্ষনাথ সম্পর্কে আছে --- (১) কনফট যোগীদের মতে - গোরক্ষনাথের জন্মস্থান ঝিলাম জিলায় টিল্লা নামক প্রাচীন পীঠস্থানে (২২ ও ২৩পৃষ্ঠা)। (২) বাবা রতন নাথের শিষ্য সম্প্রদায়ের মতে পেশোয়ারই গোরক্ষনাথের জন্ম স্থান (২২ ও ২৩ পৃষ্ঠা)। (৩) রাওয়াল পিন্ডি জেলার গোরক্ষপুর গ্রামে গোরক্ষনাথের জন্মস্থান (২২পৃঃ) । (৪) পাঞ্জাবের কাঙ্গা পাহাড়, চক্ররাজ্য , গুরুদাসপুর ও হোসিয়ারপুর প্রভৃতিতে গোরক্ষনাথেব জন্মস্থান (৭৩পৃঃ)। (৫) চন্দ্রনাথ নামক একজন আধুনিক পন্ডিত মনে করেন- গোদাবরী তীরস্থ চন্দ্রগিরি নামক স্থানে গোরক্ষনাথের জন্ম হয় এবং তিনি ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন ।(২৩ পৃঃ)। 'যোগী সম্প্রদায় বিস্ততি' নামক গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়েছে। অধ্যাপক ডাক্তার মোহন সিংহ বলেন, গোরক্ষ নাথের তিরোধান ও সমাধিস্থান দুইই অপরিজ্ঞাত (১৪ পৃঃ) (৭) .' ডক্টর কল্যানীমল্লিক বলেন, পাঞ্জাবের ঝিলমের ২৫ মাইল দূরস্থিত গোরক্ষ টীলার গোরক্ষ নাথ দেহ রক্ষা করেন বলে প্রবাদ আছে । (নাথপন্থ ১৭ পৃষ্ঠা)। (৮) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় , মিঃ সি; আর স্টুলপন্যাগ্যাল সাহেব ; স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন প্রমুখ (History of the Bengali Language and

literrature.The sikhs, E.R.E vol12) ।(৯)মিঃ জি,ডাব্লিউ ব্রিগস বলেন Gorakhnath originally came from Eastern Bengal (Gorakhnath and Kanphata yogis , page 250)'

গোরক্ষবিজয়ে দেখা যায় সিদ্ধ চৌরঙ্গীনাথের নামান্তর গাভুর সিদ্ধা।এবং তাকে 'সাল্লাবানের বেটা' বলা হয়েছে । ভোজ রাজের পুর্ব্ব পুরুষ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের পৌত্র শালিবাহনের নামান্তর হয়েছে শালবান।' (ত্রিপুরার প্রত্নৈশ্বর্য্য ও নাথসাহিত্যের দান (যোগী সখা, মাঘ, চৈত্র, ১৩৫২ বাং) কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলে শালিবাহনের নামানুসারে 'সালবানপুর' আছে। এতে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে লালমাই অঞ্চলে শালবাহন শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এই শালবনে গ্রামের সঙ্গে চৌরঙ্গী নাথের নাম জড়িত আছে- 'যেন মত চৌরঙ্গী গেল শালবান নগরে যেন মত ইচামতি বল কৈল তারে।।''

(ব্রহ্মযোগী)

কিংবদন্তীতে আছে চৌরঙ্গীনাথ শালবান রাজার পুত্র ছিলেন । তার পিতা এক নীচ জাতীয়া রমনীর প্রেমে মজে ছিলেন । কিন্তু রমনীটি চৌরঙ্গীনাথের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন । কিন্তু চৌরঙ্গীনাথ রমনীর প্রস্তাবে অসম্মাতি হওয়ায় রমনীর চক্রান্তে চৌরঙ্গী নাথ অন্ধ হয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং চৌরঙ্গী সিদ্ধা নামে খ্যাত হন । রমনীটির নাম ছিল ইছামতী।

মীননাথ কাদলীনগরে কামিনীকাঞ্চনের মায়ার আবদ্ধ হয়েছিলেন সেকথা ' সন্তলীলামৃত 'পুস্তকে আমরা পেয়ে থাকি । এ কদলী রাজ্য বলতে ত্রিপুরাকে বলা হয়েছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। কদলীনগর সম্পর্কে আমরা মহাভারতে এবং ' তিব্বতীয় ভাষায় 'পাগশ্সাস জোনবজান ' গ্রন্থে উল্লেখ দেখি । (J.R.A.S.Bengal, 1898 part 1)শিখগুরু নানকচরিত, প্রাণসংগাল' গ্রন্থের ৩১ অধ্যায়ে আছে ' কজরীবন মাছংদ্রনাথ'।বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ' গোরক্ষপুর বিজয়' গ্রন্থে 'কজলি' কদলীনগরে ' কদলীর সভা', গোপীচাদের সন্ন্যাসে 'কোদালীসহর' পদ্মা বতীর যোগীখন্ডে 'কজরীবণ', গোবিন্দচন্দ্র গীতে 'কমলীবন ' এবং জৈমিনী মহাভারতে ও বাৎসায়নের কামসুত্রে স্ত্রীরাজ্যের উল্লেখ আছে। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনুমান করেন স্ত্রী স্বাধীনতার দেশ কামরূপ মণিপুর ও ব্রহ্মদেশই কদলীরাজ্য । (ময়নামতীর গান -- ১২২ পৃঃ) ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন, কাছাড় জেলাই কদলী রাজ্য -- (Leachants Mystiques page 27)

গুরু গোরক্ষ নাথ কদলী রাজ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন , ময়নামতীর পুঁথিতে মানিকচাঁদের মেহেরকুলের ঠিক সেরূপ বর্ণনা আছে। ময়নামতীর পুঁথির মত গোরক্ষবিজয়ে ও ' কার পুখনির পানি কেহ নাহি খাএ' এরূপ উক্তি আছে।

চট্টগ্রাম নোয়াখালি বা ত্রিপুরা জেলায় বহু পুকুর আছে , সে অনুপাতে অন্যান্য জেলায় ততটা নেই। কোচজাতীয় লোকেরা দেশের নানা স্থানে পুকুর খনন করত এবং সেগুলি কোচের কাটা পুষ্করিনী বলে অভিহিত করা হত । ইহারা কারো পুষ্করিনীর জল কেহ স্পর্শ করত না । ময়নামতীর লালমাই পাহাড়ে নাথসিদ্ধাদের কর্মকেন্দ্র ছিল। এখানে নাথসিদ্ধা জালন্ধর যা হাড়িফা রাজা গোপীচাঁদকে সন্ন্যাসের দীক্ষা দিয়েছিলেন । এস্থানেও অনেক প্রাচীন দীঘির ভগ্নাবশেষ দেখা যায় । সে বিচারে ত্রিপুরা জেলাকেই কি কদলী রাজ্য বলতে হয় ?

ত্রিপুরারাজ্যে সিধাই নামে একটি স্থান আছে। সেখানে তহশীল কাছারি ও থানা আছে । সিধাই এর এ

থানাটি একটি প্রাচীন দীঘির পাড়ে অবস্থিত ।এ দীঘি 'সিদ্ধার দীঘি' নামে পরিচিত। 'গোরক্ষবিজয়ে' তবে মনে চিন্তিলেক গাভুর সিধাই' তাতে সিদ্ধানাথের জপ অংশে আমার 'সিধাই' স্থানটি পেয়েছি। সুতরাং বলা যেতে পারে সিধাই স্থানটির সিদ্ধার নামানুসারে হয়েছে। ''সিদ্ধার দীঘি' নামের সঙ্গে যে সিদ্ধা শব্দের যোগ আছে তাতেও সিধাই যে সিদ্ধারই রূপান্তর তার সুস্পষ্ট আভাষ বিদ্যমান। ময়নামতী গানে সিদ্ধাদিগের দুটি সাধনস্থান সম্পর্কে উল্লেখ আছে। 'আদ্যমাটি' আছে কিছু মেহেরকুল নগর। তার আছে আদ্যমাটি তরপের দেশ'। এতে ত্রিপুরায় মেহেরকুল ও শ্রীহট্টের তরপে প্রধান সাধনস্থল ছিল পরিষ্কারই বুঝা যায়। শ্রীহট্টের তরপ পরগণা ত্রিপুরারই উত্তর সীমান্তবর্তী ।সিধাইতে যে সিদ্ধার নিদর্শন দেখা যায়, তা ত্রিপুরারই উত্তর সীমান্তে। সে হিসাবে তরপের সিদ্ধস্থানকে সিধাইয়ের সঙ্গে অভিন্ন বলা যেতে পারে। এবং এ সিধাই নামক স্থানেই মীননাথ আগত হয়েছিলেন এ ধারনাই স্বাভাবিক ।সিধাই সে যুগে শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং সিধাইকে কদলীরাজ্য মনে করা যেতে পারে।

এ নাথপন্থীদের সম্পর্কে বিশেষ করে গোবিন্দচন্দ্রের কথা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে কথিত হয়েছে। কামরূপ অঞ্চলের 'শিয়ে গীতে' মালিক মুহম্মদ বিরচিত হিন্দী ভাষায় প্রাচীনতম গ্রন্থ 'নহমাবতী' সুধাকর দ্বিবেদীর রচিত উপাখ্যান,লক্ষ্মণ দাস বিরচিত হিন্দি গাথা' বিশ্বেশ্বর বসুর সংগৃহীত উত্তর বঙ্গের আধুনিক গাথা' তিব্বতীয় গ্রন্থদি, মানিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম মঙ্গল প্রভৃতিতে বিভিন্ন আকারে গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতীর কথা উল্লিখিত আছে। ডক্টর বুকানন হ্যামিল্টন, E.E.Glazeir, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে, রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসে' চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব' প্রবন্ধে রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস 'গৌড়ের ইতিহাস লেখক প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এবং Journal of the Asiatic society of Bengal, রংপুর ডিষ্ট্রিক গোজটীয়র প্রভৃতি পত্রিকাগুলি নাথযোগীদের জন্মভূমি সাধনক্ষেত্র সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন —কারো মতের সঙ্গে কারো মিল নেই।

ত্রিপুরার তান্ত্রিক বৌদ্ধ ভাবাপন্ন শৈবনাথ গুরুদের প্রভাব প্রতিপত্তি সেদিন সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। যোধপুরের 'মহামন্দির' নগরে নাথদের প্রতিপত্তির স্বাক্ষর আজও বিদ্যমান। রাজা মানসিংহ যোগী দেবনাথের নিকট হতে দীক্ষা নেন। দ্বিতীয় নরেন্দ্রদেব মৎস্যেন্দ্রনাথকে নেপালে আমন্ত্রণ করে আনেন। এবং নেপালে নাথধর্ম্মের প্রসার লাভ করে আজও নেপালে মৎস্যেন্দ্র রথযাত্রা প্রতিপালিত হয়। তিব্বতে গোরক্ষনাথ, পূজিত হন। মৎস্যেন্দ্র নাথ, গোরক্ষনাথ জলান্ধর নাথ বা হাড়িফা সিদ্ধ, (নামান্তরে বালপবাদ) এক একজন এক-একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। কানুফা সিদ্ধার পূর্বনাম ছিল কৃষ্ণচার্য। B.H Hodgson,Journal of the Royal Asiatic society অষ্টাদশ খন্ডের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় এদের সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। Wilsons তার Religious roots of the Hindu গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায়,Hart land Primitive Faternity গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৫-৬পৃষ্ঠায় । Temple সাহেবের বইয়ে crook সাহেবের ' popular Religion & Folklore of Mother India গ্রন্থে India Antiquary Journal of the Asiatic Society of Bengal প্রভৃতি গ্রন্থে, 'পঞ্চরক্ষা ' মারাঠী ভাষায় রচিত 'জ্ঞানেশ্বরী' 'ভক্তমন সম্প্রদায়' সন্তলীলামৃত ' তথ্য বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। এ নাথ যোগীদের নাথের সঙ্গে জড়িত হয়ে মানিকচঁন্দ্র ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রের কথাও সমগ্র ভারতে প্রকাশিত হয়েছে।

' হিন্দী ভাষায় সুপ্রাচীন গ্রন্থ ' পদুমাবতিতে রাণী ময়নামতীকে বিক্রমাদিত্যের ও যোগী ভতৃহরির

ভগিনী ছিলেন বলে উল্লেখ আছে। ভতৃহরির (ভরথরি) কল্যাণনগরের চালুক্য বিক্রমাদিত্যের ভাই ছিলো ভতৃহরিও বিরাট রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তবেই দেখা যায় হিন্দুস্থানীদের মতে গোপীচাঁদ বিক্রমাদিত্য ও ভতৃহরির মতে গোপীচাঁদ বিক্রমাদিত্য ও ভতৃহরির ভাগিনেয় ছিলেন। বারানসীতে মুদ্রিত (বড়া) ' ভরথরী চরিত্রে' এর সমর্থন পাই।

দাক্ষিণাত্যের রাজ রাজেন্দ্র চোড় তিরুমল পর্ব্বতস্থ তোলেশ্বরী দেবীর মন্দিরের নিকট বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে তাতে তার বিজয়কাহিনী ক্ষোদিত করেন। Prof Hultzsch এ উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে ঐ স্তম্ভলিপি নবম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে (১০২৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হয়। সুরেশ্বরের শব্দপ্রদী গ্রন্থের আলোচনায়ও বোঝা যায় তার প্রপিতামহ দেবগণ দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোবিন্দচন্দ্রের রাজ সভায় প্রধান রাজবৈদ্যরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তার রাম চরিতে'র ভূমিকায় যে মন্তব্য করেছেন তৎদ্বারাও এ উক্তি সমর্থিত হয়। গৌড়ের ইতিহাস গ্রন্থ বলে ' গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক ১০০১২ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হন। গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মানিকচন্দ্রের রাজত্বকাল ৯৭০ - ৯৯০ এবং গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকাল ১০৫ - ১০৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে ক্ষীরোদ নদীর উল্লেখ আমরা পাই। এ ক্ষীরোদ নদী ময়নামতী ও লালমাই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হত। ঐতিহাসিক নিবারণ চন্দ্র ঘোষ মহোদয় তার এক প্রবন্ধে বলেন – 'ক্ষীরোদনদীর অস্তিত্ব লোপ পায় কিন্তু আলেখার চর, বিনন্দিয়ার চর (নদীর ঘাট) বিনন্দিয়া অর্থ সৈন্য। সাধিনের চর, লোয়ার চর, মন ঘাটা (নদীর ঘাট) কুরপাই (নদীর কুর) ইত্যাদি নামের দ্বারা এই গ্রামগুলি যে এককালে নদীর সংস্রব ছিল তা অনুমিত হয়। গৌরীপুরের কাছাকাছি ইচ্ছাপুর গ্রামের নিকট ক্ষরাইর খাল' নামে একটি ক্ষুদ্র খাল এখনও বিদ্যমান আছে। ময়নামতী পাহাড়ের দক্ষিণাংশের লালমাই পাহাড়ের উত্তরাংশে ঘোষনগর নামে একটি গ্রাম আছে। ঘোষনগর গ্রামেও লালমাই ময়নামতীতে অতি শ্বেতবর্ণের একরকম প্রস্তরখন্ড দেখা যায় যার উৎপত্তি একমাত্র নদীতে হওয়াই সম্ভব। স্থানীয় লোকেরা এসব প্রস্তরকে গন্ডীশীলা বলে। লালমাই পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরগুলি পরীক্ষা করে বোঝা যায় এগুলি সমুদ্র গর্ভ হতে উত্থিত হয়েছে। কেহ কেহ বলেন লালমাটির পাহাড় বলে একে লালমাই বলে।'

চন্দ্রবংশের জনৈক রাজা জয়চন্দ্রের সভাকবি নাথ ব্রাহ্মণ ভবানী নাথ ' লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়' 'রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। এ পালাগুলি ময়নামতী গানের সমসাময়িক। 'মানিকচাঁদের গানে' আমরা জানতে পারি মানিকচাঁদ গোবিন্দ চাঁদ ক্ষেত্রীকূলের বেনিয়াবংশ সম্ভুত ছিলেন। 'বেনিয়া জাতি ক্ষেত্রীকূল হেলাতে হারামু।' ' ময়নামতী গানের ' ভিতরগত প্রমাণাদি দ্বারা এ সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়। ধর্ম্মনন্দ মহাভারতীর মতে গোপীচন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। দুর্গাচরণ সন্যাল মহাশয় গোপীচন্দ্রকে রাজবংশী বলেছেন। যাহোক ত্রিপুরারই এক রাজার এত বড় খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ত্রিপুরার পক্ষে গৌরবের কথা।'

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন ' ময়নামতী গান' ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতিতে' ত্রিপুরার কোন উল্লেখ নেই। কোন কোন অংশে বরঞ্চ বঙ্গের'ই উল্লেখ আছে। এতে অনুমতি হয় যে 'মেহের কূল' পাটিকারা পূর্ববঙ্গ নামেই পরিচিত ছিল। ত্রিপুরা কর্তৃক বিজিত হলেই তবেই ত্রিপুরার অন্তর্ভূক্ত হয়ে ত্রিপুরা নামে

পরিচিত হয়।

মেহেরকুলের শেষ রাজা রণবঙ্কমল্ল পাটিকারা ও কমলাঙ্কের শাসনদন্ড পবিচালন করতেন সেকথা পূর্বেই আমরা বলেছি। রনবঙ্গের সময়কাল ১২১৯ খৃষ্টাব্দে। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় লিখিত আছে যে, ত্রিপুববাজ ছেংথুংফার (সিংহতুঙ্গকার) সময় গৌড়ের সঙ্গে ত্রিপুরার যুদ্ধ হয় এবং ছেংথুংফা যুদ্ধ করতে ভীত হলে তার রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী সে যুদ্ধ জয় করেন এবং মেহেরকুল ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত হয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় লক্ষ্মণসেন ১১৯৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রণবঙ্ক তার সমসাময়িক । সুতরাং রণবঙ্কের সময়েই মেহরকুল পাটিকারা যে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় । তা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব।

'ময়নামতীগান' ও ' মীনচেতন' দুটি বই আলোচনা করলে মনে হয় যে উক্ত পুস্তকদ্বয়ের মধ্যে সিদ্ধাগানের যে কাহিনী বলা হয়েছে তাতে নাথপন্থীদের ত্রিপুরার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার কথাই অধিক। এ দুটি পুস্তকই ত্রিপুরা থেকে উদ্ধার হয়েছে। সুতরাং উভয়েরই রচয়িতা যে ত্রিপুরাবাসী তা স্বাভাবিক ভাবেই মনে উদয় হয়।

রাজা গোপীচাঁদ স্বয়ং গুরু হাড়িফার সাথে বনে গমন কালে পথশ্রম লাঘবের জন্য হাড়ি ফার নির্দ্দেশে এক জাঙ্গাল (ক্ষুদ্ররাস্তা) তৈরী করেন। ত্রিপুরার রাজ ইতিহাস ' রাজমালা' গ্রন্থে একে ' হাড়িফার' ' জাঙ্গাল' বলা হয়েছে। ময়নামতীর গানে সে সম্পর্কে আছে –

' সিদ্ধা এ কৈলে দৈত্যবর মোর আজ্ঞা পরে। সুরিপু যাইতে এক জাঙ্গাল দেও মোরে
হাড়িফার আজ্ঞা যদি দৈতগণ পাইল । আজ্ঞা অনুরূপ এক জাঙ্গাল বান্দিল।"
(' ময়নামতীর গান, ২য় সংস্করণ ২৭পৃঃ)

দৈত্য যে শুধু জাঙ্গাল করেছিল তা নয় একটি দীঘিও সে খনন করে দিয়েছিল। ময়নামতী পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের চূড়ায় চন্ডীমন্দির। পাশাপাশি দুটি মন্দির। একটিতে শিব অপরটিতে চন্ডী। এদের পাশে দ্যুত্যার দিঘী। দ্যুত্যা যে দৈত্যের অপভ্রংশ সে কথা বলাই বাহুল্য। এখানে যেমন দ্যুত্যার দিঘীর কথা আছে, সেরূপ পূর্ব্ব লালমাই পর্বতে হাড়িফার নামের পূর্ব পরিচিত দীঘির উল্লেখ আমরা পেয়েছি। সুতরাং হাড়িফা ও দৈত্যের সম্পর্কের স্পষ্ট নিদর্শন এখানে আছে। শৃঙ্গটী চন্ডীমূড়া বলেই দেবীর প্রভাবের আভাস আছে। চন্ডীমন্দির ও চন্ডীমুড়ায় তা বিশেষ রূপেই পরিস্ফুষ্ট। এ সম্পর্কে বৈকুণ্ঠ নাথ দত্তের এক পত্রে আছে 'মুদ্রিত গান্তীরা' গ্রন্থে দেখিতে পাই, হাড়িফা বর্দ্ধমানে বল্লুকানদীর তটে প্রথম ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তন করেন। মুদ্রিত ' ধর্ম্মপূজা বিধান' গ্রন্থে দেখিতে পাই কেউবা দেবী ধর্ম্ম পূজার পুষ্প' উপহার পাইয়া থাকেন। ময়নামতীর ৪/৫ মাইল দূরে কউড়া নামে একটা গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে কউড়া দেবীর একটা ইস্টক নির্মিত দেউলও ছিল। উক্ত দেউল এখন ভগ্ন। কোন বিগ্রহ থাকিলেও তাহার প্রকাশ নাই।

' টপকা মুড়ার প্রায় ৩০০ হাত উত্তরে দাউদাকান্দি রাস্তার উত্তরে মরদনগর রাস্তার পশ্চিমে লাইমাই পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উপর ভগ্ন ও ভূপ্রোথিত ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাইল দীর্ঘ বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে ।' (ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী)।

কবিচন্দ্র দাস লিখিত ' গোরক্ষ বিজয়' ফেনী নিবাসী অশ্বিনী কুমার সোম তত্বনিধি দ্বারা পরশুরাম থানার এলাকাধীন সাতকুচিয়া গ্রামের কোনও গৃহস্থ হতে সংগৃহীত এবং তৎকর্তৃক ১৩৩৯ বাংলা সালে সম্পাদিত

ও প্রকাশিত ‘ এই পুস্তক সমাপ্ত দ্বিতীয় বাসরস্য বেলা দশ দন্ডাপুমানে এয়োদশ তিথিতে শুভম শকাব্দ ১৭৩৭ ইতিসন ১২২৫ ত্রিং তাং ৩০ জ্যৈষ্ঠ্য শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মাণিক্য মহারাজা আমলে। স্বাক্ষরমিদং শ্রীজগন্নাথ দেব বর্ম্মণ এই পুস্তক মালীক শ্রীরাম কান্ত দেব বর্ম্মন লেখক ও মালীক নমঃশূদ্র জাতির ব্রাহ্মণ।' ১২২৫ ত্রিং (ত্রিপুরাব্দ) ১২২২ বাংলা। মহারাজ গঙ্গাধর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজমালার উল্লেখিত রামগঙ্গা মাণিক্য।' (বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি রাজমোহন নাথ)

ত্রিপুরার নাথ পন্থীদের পুঁথি রচিত হওয়ার প্রমাণ উপরিল্লিখিত পুথি হতে বোঝা যায়। মীননাথের জীবন অবলম্বন করে ‘ মীনচেতন ’ কাব্যটি রচিত তা ত্রিপুরার ময়নামতী নিকট আবিষ্কৃত হয়। এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা থেকে মীননাথ যে ত্রিপুরার ময়নামতী অঞ্চলে ছিলো এবং এ অঞ্চলে সিদ্ধি অন্য কোন স্থানের বাসিন্দা হতেন তবে সে স্থানের কীর্তি গাঁথা গানে বা কাব্যে প্রচলিত দেখতে পাওয়া যেত। ময়নামতী প্রদেশের রাণী ময়নামতী ও তার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের ঘটনা নিয়ে যে ময়নামতী কাব্য রচিত হয়, তাতে মীননাথের চরিত্রের যে আভাষ রয়েছে, ‘ মীনচেতনে ’ তাই আখ্যান বস্তু হয়েছে। মীননাথ সম্পর্কে এরূপ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। সে হিসাবে মীননাথকে ত্রিপুরার বলে দাবী করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্ত্তমানে ত্রিপুরা প্রশাসনের অধীনে যে সরকারী যাদুঘর পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে সযত্নে ‘ মীনচেতন’পুথি একটি সংরক্ষিত আছে।

ত্রিপুরাজ্যের রাজাদের অধীনে আমরা নাথপন্থীদের শ্রীমঙ্গল রাজ্যের কথা জানতে পারি। (খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকে দাক্ষিণাত্যের মঙ্গলামঠের কোন নাথযোগী বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণাংশে সে সময়কার সমতট রাজার অধীনে সামন্ত রাজ্যরূপে অধিষ্ঠিত হল।) রাজ্যেশ্বরের দেবীর নাম ছিল মঙ্গলা এবং রাজার নাম করণ হয়েছিল শ্রীমঙ্গলা। শ্রীমঙ্গলা রাজ্যের নাথের স্মৃতি আজও শ্রীমঙ্গল সহর এবং থানায় রক্ষিত আছে। শ্রীমঙ্গল থানার কালাপুর গ্রামে মরুণ্ডনাথের তাম্রকলি আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তী দশম শতকের চন্দ্রবংশীয় সমতট নৃপতি শ্রীচন্দ্রদেবের একখানা তাম্রকলিও ঐ অঞ্চলের পশ্চিম ভাগ গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। শেষোক্ত তাম্রকলিতে রাজা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তির অন্তর্গত শ্রীহট্টমন্ডলে কুশিয়ারাও মনি মনি (মনু) নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। এই শ্রীমঙ্গলসহ দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমা সমতল ত্রিপুরা জেলার সংলগ্ন পূর্বদিকে এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরার সংলগ্ন উত্তর দিকে অবস্থিত। সমতল ত্রিপুরা জেলায় ছিল পূর্বোক্ত মেহেরকুলের রাজ্য ও পাটিকারা রাজধানী। পরবর্তীকালে মেহেরকুল রাজ্য ত্রিপুরা নৃপতিদের অধীনে আসে।

ত্রিপুরার কৈলাসহরস্থিত ঊনকোটিতে যে সব মূর্তি আছে, তাদের মধ্যেও অনেক নাথপন্থীদের পূজিত মুর্তির সন্ধান মেলে। যদিও এ সম্বন্ধে অদিবাসীদের মতানৈক্য থেকে গেছে। তা সত্বেও বলা যায় ‘কৌলধর্ম্ম অজ্ঞাত সে নাথ ধর্ম্মের প্রভাব পালপর্বেই অনুভূত হয় পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট কুমিল্লা ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায়। সেই নাথধর্মী দেবদেবীর মূর্তি কল্পনার নজীরও হয়তো ঊনকোটিতে দুর্ল্লভ নয়। কিন্তু মূর্তি কল্পনা অবিমিশ্র নাথধর্মী কিনা সে সম্বন্ধে সংশয়ই থেকে যায়। (অবহেলিত ঊনকোটি - সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নাগরিক, শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৭বাং)। তবেই দেখা যায় এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা এখনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তবু বলা যায় ত্রিপুরায় এককালে যেমন শৈব শাক্ত ধর্মের কেন্দ্রস্থল হিসাবে সিদ্ধ পুরুষগণ ত্রিপুরায় এসে সাধনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করতেন তাতে ঊনকোটিতে নাথপন্থীদের মূর্তি থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে একই কিংবদন্তীর কথা এখানে বলা যায় বহুপূর্বে গগণ নামে এক

সাধু পুরুষ (৮৪সিদ্ধার অন্যতম গগণফা কিনা সঠিক বলা যায়না) বৰ্দ্ধমান থেকে এসে লালমাই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সেখানে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও শিষ্যানু শিষ্য বৰ্দ্ধিত হতে থাকলে ত্রিপুরার সে সময়কার মহারাজা তাকে তলব দিয়ে আগরতলায় আনেন। তার ক্ষমতা দেখবার উদ্দেশ্যে তালাবন্ধ অবস্থায় হাওড়া নদীতে ফেলে দেন? এ অবস্থায় সাত দিন জলে থাকার পর ও গগণ ফা জীবিত দর্শনে ত্রিপুরেশ্বর তাকে লাইমাই পাহাড়ে বিস্তর ভূমি নিষ্কর প্রদান করেন ।

'The Nathists similarly chanted their chronicles It is interesting the their favourite instruments was named the Gopi Yantra after their hero Gopichand. (Forword, May,22th 1927)

ত্রিপুরায় তথা বাংলায় সর্বত্র গোপীচাঁদের গানের জন্য এক নূতন বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছিল। এর নাম 'গোপীযন্ত্র' ইহা বাউলদের একতারা নামে সাধারণতঃ পরিচিত ।নাথ যোগিগণই প্রথম এ যন্ত্র যোগে গান করত ।

পরবর্তীকালে বল্লাল সেনের যুগ থেকে যোগধৰ্ম্ম প্রচারক নাথ আচার্যগণের বংশধর শৈব যোগীগণ ও অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় সামাজিক পরিবর্ত্তনের ফলে জাতিতে পরিণত হয়ে পড়ল। যোগীরা নিজেদের শিব থেকে উৎপত্তি বলে স্বীকার করেন। সেজন্য তারা নিজেদের রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেন । তারা ব্রাহ্মণের মত দশাশৌচ পালন করেন, সামবেদীর মত ক্রিয়াকান্ড করেন । স্বহস্তে ভোগ রন্ধন করে দেব দেবীগণকে নিবেদন করে। প্রণবমন্ত্র উচারণ কবে।এবং নাথের শেষে 'দেবী' ও দেবনাথ উপাধি ব্যবহার করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যায় কঠোর দরিদ্রতা বশতঃ পরিপার্শ্বিক আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধতাপূর্ণ চাপে যোগীজাতির সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অর্থ ও শিক্ষা সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি।যোগী সমাজে এ দুটিরই অভাব দেখা দেয় । যে কারণেই ধীরে ধীরে তারা সমাজের নিম্ন স্তরে নেমে যেতে বাধ্য হয় ।' পূর্বের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে থাকে ।নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাদের অধিকাংশকেই তন্তুবায়, মনিহারী চুন বিক্রয় প্রভৃতি ব্যবসায় নেমে পড়তে বাধ্য করে ।' (নাথপন্থ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ - ডক্টর কল্যাণী মল্লিক)

বল্লালী অত্যাচারে ভারতের তথা আসাম বাঙলার যোগীজাতির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে । এবং শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহার রীতিনীতিতে তারা দিন দিন হীন হয়ে পড়েছে। তাতে যোগীজাতির আচার ব্যবহার হতে স্খলিত হয়ে পড়ে ।ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত বর্তমান নাথপন্থীদের সম্পর্কে বলেছেন — 'মূলে যাহা ছিল একটি যোগমার্গের ধৰ্ম্ম সম্প্রদায় কালের বিবর্ত্তনে তাহাই রূপান্তরিত হইল একটি জাতি মাত্রে । বাঙলার যোগী সম্প্রদায় এখন অনেক খানেই বাংলাদেশের আদিবাসী বহু জাতির মধ্যে একটি মাত্র।' একথা শুধুমাত্র বাংলাদেশের বেলায় প্রযোজ্য নয় - ত্রিপুরা রাজ্যের নাথ পন্থীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য ।

ত্রিপুরার পুঁথিচর্চা

ত্রিপুরার পুঁথি চর্চা সম্বন্ধে বলার পূর্ব্বে প্রাক্‌কথন হিসেবে পুঁথি সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন। সাধারণত আমরা প্রাচিন সাহিত্যকে পুঁথি সাহিত্য বলে থাকি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের পুরোহিত পুত্র মধুসূদন দাসের অনুরোধে স্যার জন লরেন্স হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষার জন্য প্রাদেশিক গর্ভণর, পরে ভারত গর্ভণরের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। ভারত গর্ভণমেন্ট ৩২০০ টাকা বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের পুঁথি সংগ্রহের জন্য মঞ্জুর করেন। সে অনুযায়ী সে সময় পুঁথি সংগ্রহের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। ১৭৭৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী যে এশিয়াটিক সোসাইটি পত্তন হয়েছিল স্যার লরেন্সের সময় সেই সোসাইটির কর্মকর্তা ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মহোদয়। তাঁর উপর ভার পড়ল পুঁথি সংগ্রহের। তিনি ৩২০০ টাকা দিয়ে শুধুমাত্র সংস্কৃত পুঁথিই সংগ্রহ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে পদে বহাল হন। সে সময় দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় তাঁর ভৃত্য রামকুমার দত্তকে পুঁথি সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অধিকাংশ পুঁথিই রাম কুমার দ্বারা সংগৃহীত হয়। অপরদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় এশিয়াটিক সোসাইটির পন্ডিত বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থকে বাংলা পুঁথি সংগ্রহের জন্য কুমিল্লায় প্রেরণ করেন এবং সে সময় কুমিল্লা থেকেই ৪০০ শত পুঁথি সংগ্রহ করা হয়। দীনেশ সেন মহোদয় সে সময় বাংলাব প্রতিটি পল্লীতেপল্লীতে ঘুরে পুঁথি সংগ্রহের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। তাঁর কাজের পেছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ এবং ত্রিপুরার মহারাজার আর্থিক সহানুভুতি বন্ধুবর কর্ণেল মহিম ঠাকুরের আর দেশবাসীর সহযোগিতা। ফলতঃ পরবর্ত্তী কয়েক দশকেই দীনেশ সেনের কর্ম্মধারা অনুসরণ করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপক কাজ শুরু হয়। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে মোটামুটি পুঁথি সংগ্রহের সালতামামী হতে জানা যায় এই ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায়, রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগৃহীত ৩০০৯টি পুঁথি, মেদিনীপুর নিবাসী সনৎ কুমার রায় সংগৃহীত ২ হাজার পুঁথি এবং রাম কুমার দত্ত অবিনাশ চন্দ্র দত্ত ও হরিদাস পালিত প্রভৃতিসংগৃহীত পুঁথি নিয়ে আরও সাত হাজারের মত পুঁথি সংগৃহীত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ করেন ৩১০০ পুঁথি। বীরভূমে শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রতন লাইব্রেরীতে প্রায় ২০০০ হাজারেরও বেশী পুঁথি সংগৃহীত হয়। চট্টগ্রামের আবদুল করিম সাহেবেব নিজস্ব লাইব্রেরীতে ১২০০ শত পুঁথি সংগৃহীত ছিল। কুমিল্লা রামমালা রিসার্চ্চ লাইব্রেরীতে ৭০০০ হাজার সংস্কৃত পুঁথি এবং ১৪০০ শত বাংলা পুঁথি রক্ষিত ছিল। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ যাহা ১৩৪২ বঙ্গাব্দে স্থাপিত হয়েছিল সেখানেও ছিল ৪৮০ খানা পুঁথি। এশিয়াটিক সোসাইটিতে বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন পুঁথি সংখ্যা ৪০০০০ হাজারেরও বেশী ছিল। কুমিল্লা জিলা স্কুলের শিক্ষক আলী আহাম্মদ মিয়াসাহেবের নিজস্ব সংগ্রহ শালায় ১২০০ শত পুঁথি ছিল।

ত্রিপুরায় এ পর্য্যন্ত যে সব পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি অধিকাংশই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর। ১১৯৩ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) মহারাণী জাহ্নবী দেবী ত্রিপুবার রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১১৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে) পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য পবিচালনা করেন। মহারাণীর রাজত্ব কালে যে দুটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে সে দু'টী হল ১) শলা পর্ব। রচয়িতা সঞ্জয়। রচনার তারিখ ১১৯৩ ত্রিপুরাব্দ। ২) শ্রীরাম চন্দ্র অভিষেক, লেখকের নাম পাওযা যায়নি। রচনা কাল ১১৯৪ ত্রিপুরাব্দ।

দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্য ১১৯৫ ত্রিপুরাব্দ থেকে ১২১৮ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্যের সময়ে ১২১১ ত্রিপুবাব্দে মহাভারতের একটি পুঁথি রচনা করেন সঞ্জয় ও গোপী নাথ দত্ত। সে পুঁথিটির প্রথম দিকেই ছয়টি পৰ্ব্ব নেই ২৩৭ পৃষ্ঠা থেকে ৫৮৪ পষ্ঠা পর্যন্ত পাওয়া গেছে। প্রত্যেক পত্রে দু'টি করে পত্রাঙ্ক। এই মহাভারতটিতে দ্রোণ পর্ব, কর্ণ পর্ব, শল্য পর্ব, সৌপ্তিক পর্ব, ঐষীক পর্ব,, স্ত্রী পর্ব, শান্তি পর্ব অনুশাসন পর্ব, জামুল পর্ব, অশ্বমেধ পর্ব পর্য্যন্ত আছে। ১২১৩ ত্রিপুরাব্দে রতিদেব 'মৃগলুব্ধ' রচনা করেন। মহারাজা রামগঙ্গা মাণিক্যের আমলে ১২১৫ ত্রিপুরাব্দে "এজিদের পরী লুঠ" পুঁথিটি রচিত হয়। লেখকের নাম নেই। পত্র সংখ্যা হল এক থেকে সাত। ১২১৭ ত্রিপুরাব্দে ভবানীনাথ "শ্রীরামচন্দ্রাভিষেক দিগ্বিজয়" পুঁথিটি রচনা করেন।

১২১৯ ত্রিপুরাব্দে (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) দুর্গামাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহন করেন। সে সময় ১২২১ ত্রিপুরাব্দে সঞ্জয়ের রচিত মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব নামক পুঁথিটির সন্ধান পাওয়া যায়। পুঁথিটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৭। ১২২২ ত্রিপুরাব্দ যদুবন্ধু দাসের শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন পুঁথিটিরও সন্ধান মেলে ।

১২২৩ ত্রিপুরাব্দ(১৮১৩ খৃঃ) দুর্গামানিক্যের মৃত্যুর পর পুনরায় ত্রিপুরার সিংহাসনে রামগঙ্গা মানিক্য অধিষ্ঠিত হন। সে সময়ের (১২২৫ ত্রিপুরাব্দে) দুটি পুঁথির খোঁজ জানা যায়। ১) কবি চন্দ্র দাস রচিত 'গোরক্ষ বিজয়' ফেনী নিবাসী অশ্বিনী কুমার সোম তত্ত্বনিধি দ্বারা পরশুরাম থানার এলাকাধীন সাতকুঁচিয়া গ্রামের কোনও গৃহস্থ হ'তে সংগৃহীত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৩৩৯ বাংলা সালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত — "এই পুস্তক সমাপ্ত দ্বিতীয় বাসরস্য বেলা দশ দন্ড পুরাণে ত্রয়োদশ তিথিতে শুভমস্তু শকাব্দ ১৩৩৭ ইতি সন ১২২৫ ত্রিং ৩০শে জৈষ্ঠ্য শ্রীশ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মাণিক্য মহারাজ আমলে। স্বাক্ষরমিদং শ্রীজগন্নাথ দেব শৰ্ম্মণ এই পুস্তক মালিক শ্রীরামকান্ত দেবশর্ম্মণ। লেখক ও মালিক নমঃ শূদ্র জাতির ব্রাহ্মণ। ১২২৫ ত্রিপুরাব্দ, ১২২২ বঙ্গাব্দ। মহারাজা গঙ্গাধর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজমালায় উল্লিখিত রামগঙ্গা মাণিক্য (বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি বাজমোহন নাথ) (২) আবদুল রহিম লিখিত "সাহামাদারের নিকট সাহা ছালেকের ছওয়াল"। পুঁথিটির সময়কাল ১২২৬ ত্রিপুরাব্দ (৩) জখমার যুদ্ধ ১২২৮ ত্রিপুরাব্দ। (৪) 'গোরক্ষ বিজয়' ১২২৯ ত্রিপুরাব্দ কুমিল্লার ডাক্তার আলী অজ্জমের বাড়ীতে পাওয়া যায়। (৫) মহাভারতে বিবেকের যুদ্ধ' গঙ্গাদাস সেন ১২৩০ ত্রিপুরাব্দে রচনা করেন।

১২৩৯ ত্রিপুরাব্দে যুবরাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ বিশ বৎসর রাজত্বকাল সময়ে ত্রিপুরায় যেসকল পুঁথি রচিত হয়েছিল তার মাঝে যেগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি হল ঃ- ১২৪২ ত্রিপুরাব্দে – (ক) ভবানীদাশের 'নৌকাখন্ড ' (খন্ডিত) (খ) দ্বিজরামকৃষ্ণের 'জ্ঞান চৌতিশা', (গ) 'সখীর বারমাস', ১২৪৫ত্রিপুরাব্দে । 'সহরনামা '— আবদুল হাকিম খন্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ১২৪৬ ত্রিপুরাব্দে (ক) 'গোবিন্দ বিজয়'-– গুণরাজ খান । (খ) 'কোকিল সম্বাদ'। ১২৪৯ ত্রিপুরাব্দে মৃগলুব্ধ' — দ্বিজ রতিদেব । ১ ২ ৫ ১ ত্রিপুরাব্দে। (১) মোহাম্মদ আকববের রচিত ' জেবুল মুল্লক শামারুক' । (২) মোহাম্মদ কাসিমের একটি পুঁথি। যদিও পুঁথিটির নাম পাওয়া যায়নি। ১২৫৩ ত্রিপুরাব্দে — 'অযোধ্যাকান্ড ও অরণ্য কান্ড' দুটি পুঁথির রচয়িতা হিসাবে কৃত্তিবাসের নাম পাওয়া যায়। ১২৫৫ ত্রিপুরাব্দে 'কেয়ামতনামা দজ্জালনামা' পুঁথির রচনা করেন মোহাম্মদ খাঁন।

১২৫৯ ত্রিপুরাব্দে ঈশান চন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করেন । তিনি ১২৭২ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত

রাজত্ব করেন। সে সময়ে ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দে 'গদামল্লিক' পুঁথিটি — শেখ সাদী, ১২৬০ ত্রিপুরাব্দে 'রামায়ণে সুন্দর কান্ড' পুঁথিটি কৃত্তিবাস, ১২৬৩ ত্রিপুরাব্দে 'ইছুপ জোলেখার পুস্তক' খন্ডিত পুঁথিটি গরীব ফকির, ১২৬৯ ত্রিপুরাব্দে 'নিমাই চান্দের বারমাস ও 'সুধন্যার স্তব' দুটি পুঁথি — কোনটিতেই লেখকের নাম নেই। ১২৭০ ত্রিপুরাব্দে সঞ্জয়ের ভীম পর্ব' পুঁথি দুটি রচিত হয়। ১২৭৮ —৭৯ ত্রিপুরাব্দে 'জেবল মুল্লুক' মোহম্মদ আকবর। ১২৭৯ ত্রিপুরাব্দ 'লালমতি' — আবদুল হাকিম।

১২৫২ ত্রিপুরাব্দ হতে ১২৫৪ ত্রিপুরাব্দ তিন বৎসরে 'শেখ চান্দ' ' রসুল বিজয়' নামে পুঁথিখানির রচনা শেষ করেন। শেখ চান্দ পীর শাহদ্দৌল্লার শিষ্য ছিলো এবং নিজেও একজন সাধু প্রকৃতির লোক ছিল। ত্রিপুরা জেলার (অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা) বাকসার গ্রামে শেখ চান্দের দরগা আছে। শেখ চান্দ কিছুকাল পাটিকারা রাজ্যে বাস করেছিলেন। তাঁর রচিত অপর পুঁথি কেয়ামত নামায় দু'টি তারিখ পাওয়া গিয়াছে।

১। ক, এক সও বাইশ পুস্তক।

খ, এগারশ' বাইশ সন রচিল পুস্তক।

তাতে মনে হয় ১১২২ ত্রিপুরাব্দে। এবং অপরটি (২) হল এক সহস্র বাইশ সনে পুস্তক রচন।

এখন বলা যায় সে যুগে ত্রিপুরার মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় পুঁথি চর্চাও কম হয়নি। সেদিক থেকে বলা যায় মহারাজ রাজধর মানিক্যের আদেশে রামগঙ্গা বিশাবদ 'কৃষ্ণমালা' রচনা করেন। মহারাজা কৃষ্ণমানিক্যের আমলে নোয়াখালীর দক্ষিণ শিকবাসী কবি মনোহর আলী 'গাজীনামা' পুঁথি রচনা করেন। ১০৯২ ত্রিপুরাব্দে মহারাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের আমলে গ্রাম্যকবি মহিউদ্দিন 'চম্পক বিজয়' রচনা করেন। ১২২৯ ত্রিপুরাব্দে বরদাখাত পরগণার রোয়াচালা গ্রামের নন্দকিশোর শর্মা 'বরদামঙ্গল' পুঁথিটি রচনা করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উপরিলিখিত পুঁথি রচযিতাগণের অধিকাংশই সেদিন ত্রিপুরা মহারাজাদের অধীনে বৃহত্তর ত্রিপুরায় বাস করিতেন। এবং প্রত্যেক পুঁথি রচয়িতাই তাদের পুঁথিতে অব্দ হিসাবে ত্রিপুরাব্দ ব্যবহার করেছেন। তাতে স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পাবে যে ত্রিপুরা মহারাজাদেব পৃষ্ঠপোষকতায় ও তাদের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ একদিন যেমন এখানে পুঁথি চর্চা হয়েছে অপরদিকে ত্রিপুররাজাগণও বহুভাবে পুঁথি রচয়িতাদের আর্থিক সাহায্য বা তাদের ভরণ - পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বেশীদিনের কথা নয় মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্যের আমলে আগরতলা বীবচন্দ্র লাইব্রেরীতে কিছু পুঁথি ছিল। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে সেসব পুঁথিগুলি আজ আর নেই। পঞ্চশ বৎসর পূর্ব্বে 'নবরস সিন্ধু' একটি প্রাচীন পুঁথি বীরচন্দ্র গ্রন্থাগারে ছিল। সে পুঁথিটির শেষভাগেব কতকগুলি পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গ্রন্থটির সময়কাল জানা যায়নি। রচয়িতা পরিচয় পুঁথিটির প্রথম দিকে ছিল। এতে লেখকের নাম ছিল কালিকা প্রসাদ। বিষ্ণুপুর পরগণায় ময়নাপুর গ্রামে কবির বাস ছিল। এতে অনুমান করা যায় সে সময় ত্রিপুরায় পুঁথি সংগ্রহের প্রতিও রাজাদের লক্ষ্য ছিল।

কিছুকাল পূর্বে ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার কর্তৃক 'রাজমালা' পুঁথি মুদ্রিত করেন ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। এ পুঁথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাচীন পুঁথির (নং ২২৫৯) সংখ্যার পুঁথি। লেখকের নাম পাওযা যায়নি তবে নকলকারী হিসাবে রামনাবায়ণ দেবের নাম আছে। ত্রিপুবার নব নির্মিত যাদু ঘরের

কর্তৃপক্ষ দ্বারা যে তালিকা বের করা হয়েছে তাতে ৮২টি পুঁথির উল্লেখ আছে। যদিও পুঁথিগুলির বিশদ আলোচনা তালিকায় নেই — সেজন্য এখনও সঠিক করে বলা যেতে পারা যাবে না ত্রিপুরার নিজস্ব পুঁথি কতগুলি। তা সত্ত্বেও কিছু পুঁথির সময়কাল তালিকাতে আছে এবং এখানকার কিছু পুঁথির শুধুমাত্র নাম আছে।

ত্রিপুরাব যাদুঘবেব তালিকা অনুযায়ী নাম পাওয়া যায় — ১। রাজমালা ২। রাজবত্নাকব ৩। রাজমালা ৪। সংস্কৃত রাজমালা ৫। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। ইহা ১২৪৪ ত্রিপুরাব্দে সুভদ্রা বৈষ্ণবীর দ্বারা নকল করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় ত্রিপুবায় পুঁথিচর্চার সঠিক ইতিহাস লেখারপূর্বে পুঁথি সম্পর্কে আরও ব্যাপক অনুসন্ধানেব প্রযোজন আছে এবং যেসব পুঁথি ত্রিপুরার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে সেগুলির বিশদ পরিচয প্রকাশ করা প্রয়োজন।

প্রাচীন ত্রিপুরার তৈতুন প্রথা

১৩২৯ ত্রিপুরাব্দের (১৯১৯ খৃঃ) ত্রিপুরা সেন্সাস বিবরণী পুস্তকে পার্বত্য প্রজাদের ঘরচুক্তি কর সম্বন্ধীয় আইনে আছে, সরকারী কর্ম্মচারী, সরকারী কাজে পাহাড়ে এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীতে চলার কালে সঙ্গের জিনিস পত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য অথবা পথ প্রদর্শক হিসাবে যে পার্বত্য প্রজাকে সঙ্গে নেওয়া হত তাকে 'তৈতুন' বলা হত। যারা তৈতুন হিসাবে কাজ করত তাদের প্রত্যেকে মাথাপিছু চারি আনা করে পেতেন। পার্বত্য প্রজাগণ তৈতুনকে তিতুন বলত। সে থেকে বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে তি অর্থে তিলাং অই তুন-তুনই অর্থাৎ নিয়া বহন করে পৌঁছে দেয়া তিলাং ঐ অই তুনই রুদি অর্থাৎ নিয়া বা বহন করে পৌঁছে দাও।একে সংক্ষেপ করে পাহাড়ী লোকেরা তিতুন বলে অভিহিত করত।তিতুন থেকেই তৈতুন শব্দের সৃষ্টি।

তৈতুনের আইন যদিও ১৩২৯ ত্রিপুরাব্দে চালু হয় তবু এ আইন বহু পূর্ব থেকেই ত্রিপুরায় চালু ছিল। ত্রিপুরা রাজসরকারের তহশীল কর্ম্মচারী যখন পাহাড় এলাকায় খাজনা ও ঘরচুক্তি (Land & house Tex) আদায় করার সময় এবং পুলিশ কর্ম্মচারীগণ মামলা মোকদ্দমার তদ্‌বীর করার জন্য ঐ অঞ্চলে যেতেন তখনই তাহারা তৈতুন নিয়োগ করতেন।

এই তৈতুন নিয়োগেরও একটা রীতি ছিল। একটি গ্রাম অতিক্রম করে সরকারী কর্ম্মচারীগণ যখন পাহাড়ে প্রবেশ করতেন এবং প্রথম যে পল্লী বা গ্রাম পড়ত তখনই সে গ্রামের তৈতুনের প্রয়োজনের জন্য ডাক পড়ত। জিনিষপত্র বহনের জন্য যে কয়জন লোকের প্রয়োজন হত তা গ্রামের সর্দার বা চৌধুরী সে অনুযায়ী তৈতুন ঠিক করে মালগুলি ভিন্ন গ্রামে পৌঁছে দিত। এই পৌঁছে দেওয়াটা ছিল বাধ্যতামূলক।এইভাবে এক গ্রাম বা বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে হাঁটাপথে তৈতুনরা মালপত্র পৌঁছে দিত। হাঁটাপথে যদিও ঘুরে ঘুরে যেতে বিলম্ব হত, তবুও তা জেনেও পথ জানা না থাকায় সরকারী কর্ম্মচারীদের তৈতুনের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত। আইন অনুযায়ী যদিও তৈতুনের মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল চারি আনা কিন্তু সে কথা পাহাড়ী তৈতুনের জানা না থাকায় অধিকাংশ তৈতুনই পয়সা দাবী করত না।এবং অনেক সরকারী কর্ম্মচারী তাদের পয়সা দিতেন না। যেহেতু অত্যধিক রাজভক্তি হেতু পাহাড়ী প্রজাগণ রাজকর্ম্মচারীগণকে রাজার প্রতিভূ মনে করত।এমন কি কোন গ্রামের পুরুষ তৈতুন না থাকলে মেয়ে তৈতুন ঐ জিনিস পৌঁছে দিত।

এ তৈতুন ব্যবস্থা যে কেবল রাজকর্ম্মচারীদের পাহাড়ে ভ্রমণের সময়েই ব্যবহৃত হত তা নয়। মহারাজের নিজ প্রয়োজনে কোন পাহাড়ী সর্দার চৌধুরীকে খবর দেওয়ার প্রয়োজন হলেও এই তৈতুন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হত।এবং উহা মহারাজের নিজস্ব আলং ঘর বা বৃন্দিয়াগারদের বৃন্দিয়াগণ একাজ করতেন। প্রসঙ্গত এখানে বৃন্দিয়া বা আলংঘরের সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

মহারাজাদের নিজস্ব কাজের (গভর্ণমেন্টের কার্য্য ব্যতীত) জন্য যাহারা নিযুক্ত থাক্‌ত তারা রাজার দেউরীঘর বা আলংঘরে বাস করত ।দেউরীঘরের একজন মুসলমান তালুকদারের (হাজারী উপাধিধারী) অধীনে কিছু মুসলমান পেয়াদা থাক্‌ত উহাদের হুদ্দাদার(হাজারী) রাজদরবারের সম্মুখের দরজায় দাঁড়িয়ে দরবারীগণের আসা যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করত এবং পেয়াদাগণ ডাক আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করত । বা গ্রামান্তরের প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম্মে নিয়োজিত থাক্‌ত ।আলং ঘরের সেইরূপ একজন হুদ্দাদার হাজারীর (ত্রিপুরা) অধীনে কিছু সংখ্যক পাইক থাকত। তাদেরকে বৃন্দিয়া নামে অভিহিত করা হত ।হাজারীগণ রাজদরবারে পার্বত্যাঞ্চলের সমস্ত সংবাদ সরবরাহ্ করে রাজার গোচরে আনত এবং সে কারণে বৃন্দিয়াগণকে পাহাড়ে প্রেরণ করা হত। বৃন্দিয়াগণও পাহাড়ে গিয়ে তৈতুনের সাহায্য নিত ।বর্তমানে এ তৈতুন প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে।

ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যের আদিকথা

প্রাচীনকালে অনেকের ধারণা ছিল ত্রিপুরা বন জঙ্গলে ঘেরা এক আদিম অধিবাসীদের বাসভূমি। তাই এক ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ পার্বত্য ত্রিপুরা নাম দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে একটা পার্বত্য অঞ্চল এখানে শুধুমাত্র সভ্যতাবিহীন কোন বর্বর সমাজের দ্বারা অধ্যুষিত । তাই ইংরেজ লেখক ম্যাকেঞ্জি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ—

"Covered with jungls inhabited by ----of whom nothing was known, save they were uncloth in wpeech and not particular as to clothing, the hills were looked moon as something oport. The Raja claimed to exercise authority with them but did not it sumed derive much profit from them. accordingly the hills become indepent perah and the Rajah who is ordinary bengali zemindar on the plains reigns an independent prince over 3000 square miles -- pland and was for many years a more ---oiute monarch than scindia of pattials, coming on law but hos sovereing will bound is on treaty to no control safe in obscurity from criticism or reform Noth Eastern Fronteir of Bengal -- p-66)

উপরোক্ত লেখাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে পার্বত্য অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য লাভের সম্ভাবনা কম ছিল বলেই শাসকগোষ্ঠী শোষণের সুবিধা করতে পারেনি । সেদিনকার পার্বত্য ত্রিপুরার শাসন ব্যবস্থা ঊনবিংশ শতব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রাচীন ধারার পথ ধরেই চলেছিল । এবং সে সময় যেকোন কারণেই হোক ত্রিপুরা রাজ্য বাংলার সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । কিংবা এও বলা-যেতে পারে যে ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষত্বের এবং বাংলার কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিরন্তর শত্রুতার সম্পর্কের জন্য। পাহাড় ঘেরা ছোট দেশটির মধ্যে যে জীবনধারা চলছিল সাহিত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে পরিচয় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে বাঙ্গালীর যোগ আদৌ নিবিড় ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কাঙর-কামতা, আরাকান প্রভৃতি রাজসভাগুলিকে যত গরুত্ব দিয়েছেন ত্রিপুরাকে ততটা দেননি । অবশ্য একথাও ঠিক উপবোক্ত অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় দৌলতকাজী আলাওলের মত কবি জন্মগ্রহণ করেননি, কোচবিহার রাজসভার মতন ধারাবাহিক ভাবে রামায়ণ মহাভারতের চর্চা হয়নি । অবশ্য একথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অনেক অল্প । নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহ অর্ন্তবিপ্লব ত্রিপুরার রাজনৈতিক স্থৈর্য্য বারবার ব্যাহত হয়েছে । সে সময় রাজসভা ব্যতীত সাহিত্য চর্চার অন্য কোন কেন্দ্র ছিল না । রাজ আনুগত্য ছাড়া কোন পূর্ণ কাব্য বা গ্রন্থ ত্রিপুরায় লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । রাজ আদেশেও যা হয়েছে তা কাব্য নয়-মূলতঃ তা রাজবংশ কেন্দ্রিক ইতিহাস । বাংলার অন্যান্য জেলার মত লৌকিক গানের রচনা অবশ্যই হয়েছে কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের চর্চা প্রায় ছিল না বললেই হয় । ত্রিপুর রাজসভার বাহির শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রসার ছিল একথা মনে করার অবকাশ অল্প ।

ত্রিপুরার প্রাচীন ডাক ব্যবস্থা

প্রাচীন কালে ত্রিপুরায় ডাক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলে রাখি আজকের মত সেদিন সুদৃশ্য রাস্তাঘাট ছিল না । ছিল না আধুনিক যানবাহন।

কোন জরুরী বিষয়ে আধুনিক কালে যেমন লাল কালিতে Urgent লিখে নিচে লালরেখা অঙ্কিত করে দেয়, ঠিক তেমনি সেদিন ত্রিপুরার অভ্যন্তরে কোন জরুরী সংবাদ পাঠাতে হলে, অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি বাংলা ভাষায় চিঠি বা আদেশ আকারে লিখে খামে আবদ্ধ করে বাচনিক ভাবে সহরের বাসকারী বৃন্দিয়াগণকে চিঠি বা আদেশের বিষয় বস্তু বুঝিয়ে দিয়ে তাহাদিগকে পাহাড় অঞ্চলে পাঠান হত। বৃন্দিয়াগণ প্রথম পার্বত্য পল্লীতে পৌছেই বাচনিক ভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে উক্ত খামে একটি লাল মরিচ গেঁথে নির্দেশ দিত যে বিষয়টি জরুরী এবং উহা এক পল্লী হতে অপর পল্লীতে পৌঁছে দিতে হবে। খামে লাল মরিচ দেখলেই সে সময় সকলেই বিষয়টি জরুরী বলে বুঝে নিত। এবং যখনই যে পল্লীতে এই লাল মরিচ গাঁথা খামটি পৌছত তখনই এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে উহা এক পল্লী হতে অপর পল্লীতে প্রেরিত হত এবং সঙ্গে সঙ্গে জরুরী সংবাদ ছড়িয়ে পড়ত ।

গুরুতর কোন কারণে অতি জরুরী কোন খবর পাঠাতে হলে, সে সময় অন্য আর এক প্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হত । যা ফুরাই বা ওয়াথ্লং বলে অভিহিত ছিল । ফুরাই সাধারণতঃ নির্মিত হত লৌহ দ্বারা – কোন কোন সময় বাঁশ দ্বারাও তৈরী হত এবং উহাকেই বিশেষ করে স্থানীয় ভাষায় ওয়াথ্লং বলা হত । সেই ওয়াথ্লং এর গোড়ার দিকে আগুন লাগিয়ে একটু পোড়া দেবার পর সেই পোড়া অংশকে দেখেই বুঝতে হত উহা অতি জরুরী খবর বহন করে এনেছে । আবার সেই ফুরাইয়ে যদি রক্ত লাগিয়ে প্রেরণ করা হত তবে বুঝতে হত যুদ্ধ কার্য্যে যোগদানের জন আহ্বান আসছে ।

পূর্ব কথিত জরুরী ব্যাপারে লাল মরিচ গ্রথিত পত্র দুর্য্যোগ সময়ে বা রাত্রিকালে চলত না কিন্তু ফুরাই বা ওয়াথ্লং কোন অবস্থাতেই বন্ধ থাক্‌ত না ।ইহা দিবারাত্র চালিত হত ।এ বিষয়ে কেহ শৈথিল্য প্রকাশ করলে শাস্তি হত ।

রাজার আদেশ ব্যতীত এ ফুরাই পরিচালিত করা নিষিদ্ধ ছিল ।এ নিয়মে সেদিন অতিসহজে এবং অল্প সময়ে সমস্ত পাহাড় অঞ্চলে সংবাদ প্রেরণ করা হত ।

১২৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৮৮৫ ইং) মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে এ প্রথা অবলুপ্ত হয় ।

ত্রিপুরার লোকযানের উপাদান

সরল সহজ ত্রিপুরার পার্ব্বত্য সমাজ। মানুষের সৃষ্ট অভাব অভিযোগকে ভগবানের অভিশাপ বলে তারা মেনে নেয়, এবং নীরবে সব সহ্য করে চালিয়ে যায় নিজেদের দৈনন্দিন জীবন। তারা জানে না কোনটা সত্যিকারের জীবন। এমনি ভাবেই দিন কাটে। এ অবস্থার মধ্য দিয়েই তাবা হাসে- কাঁদে - গান গায়, নৃত্য করে। এই জীবন খাতার মধ্য দিয়েই শিল্পী জন্মগ্রহণ করে। সৃষ্টি করে শিল্প। বাঁচিয়ে রাখে তারা। ফসল করে ফসল তোলে। আনন্দ করে।

ত্রিপুরার আদিবাসী জুম কৃষি নির্ভর। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে জুম চাষের জন্য স্থান নির্ব্বাচিন করে। যে স্থানটি পছন্দ করে সেখানে গিয়ে কিছুটা স্থান পরিষ্কার করে নেয়। তারপর একটি বাঁশের ছোট চোঙ্গা কেটে দু'ভাগ করে চিরে নেয় এবং একটু উচুতে তুলে ছেড়ে দেয়। যদি একখন্ড উপুড় হয়ে এবং অন্য খন্ড চিৎ হয়ে পড়ে তবে তাহা শুভ ফল সূচক, তিপ্রা ভাষায় বলে "পাতচা-মা"। প্রথম বারেই এরূপ হলে পুণরায় আর চাওয়ার প্রয়োজন হয় না। অন্যথায় আরও দু'বার চাওয়া হয়। তিনবার দেখেও শুভ সূচক না হলে ঐ স্থান পরিত্যক্ত হয়। আর যদি শুভ সূচক হয় তবে আরো কিছুটা স্থান পরিষ্কার করে সেখানে তিন চার হাত তফাৎ এক খন্ড বাঁশ পুঁতে তার অগ্রভাগ চিরে দু'টি বাঁশেব পলা (ওয়াফি) আড়াআড়ি ভাবে গুঁজে দেয়া হয়। তার নাম কদ্‌বা চিহ্ন। ইহা দেখা মাত্রই লোকে বুঝিতে পারে এ স্থান অন্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়ে আছে। উক্তরূপে শুভাশুভ চাওয়াকে বলা হয় "পাতকা-ব"। কেহ কেহ মনোনীত স্থানের কিছুটা মাটি এনে রাতে তা শয্যা পার্শ্বে রেখে শয়ন করে। শুভ স্বপ্ন দেখলে ঐ স্থানে জুম করা স্থির হয়।

ফাল্গুন মাসে তাদের আর ঘরে থাকবার সময় নেই, জুম কাটতে হবে। দল বেঁধে মেয়ে পুরুষ সবাই চলছে। মাথায় তাদের লাঙ্গা। লাঙ্গার মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিষ। দুপুরে রান্না করে খেতে হবে জুমে। হাতে জঙ্গল কাটার দা তাক্কাল। চলার মধ্যে ফুটে উঠে প্রাণের স্পন্দন। এই জুম কাটার সময়টি তাদের কাছে কত আনন্দের। বিশেষ করে যুবক-যুবতীর চলার মাঝে অধিক প্রকাশ পায় যখন দেখা যায় ওরা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করে চলছে।

তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে জুম কাটা হয়ে গেলে শেষ একটু অবসর। ফাল্গুনের বসন্তের শিহরণ লাগ্‌ল তাদের মনে। সেই ফাল্গুনের শিহরণে যৌবন দেবতা কার্পণ্য করে না। তার পরশ বুলিয়ে দেয় সেসব উদ্ভিন্ন যুবক - যুবতীর মনে। তারা যত অনুন্নতই হউক না কেন তারাও মানুষ, তাদের মনেও জাগে যৌবনের হিল্লোল। যুবক যুবতী চায় পরস্পর পরস্পরের মিলন।

এমনি করে জুম নির্ভর আদিবাসী 'জুম' চাষকে নির্ভর করে তাদের সমাজকে গড়ে তোলে। তাদের বিশ্বাস নূতন দা দিয়ে যদি জুম কাটে তবে তাদের জমিতে ভাল ফসল ফলবে, ভাল ধান পাবে। মহাদেবের নাম স্মরণ করে তারা প্রথমে জুম ক্ষেতে প্রবেশ করে এবং চিরদিন যে জুম প্রথা আছে তাতে কোন দিন বাধা আসবে না বলেই তাদের বিশ্বাস। সুতরাং তারা আহ্বান জানায় সবাইকে জুম ক্ষেতে আসতে। সমস্ত পাহাড় সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠেঃ —

" দা কাতাল তুইঅই বলং হুগ্ খালনি
হাপিং হালামঅ মাই মাল নানি।
আচু শিববাযনি মুং নাছাঅয
পইলা হুগ হাম খালানি মাই খুল পেব্নানি।
শ্রীযুগেব তাং চামানিঅ বাধ্য বিঘ্ন অংমাইযা
দাক্তিং ফাইদি দং অয তাংনা চাকলিযা।"

এব পব তাবা "মাই কাই মানি" (ধান বপনেব) গান গায। টাক্কল ও বীজেব খাবা নিযে আনন্দেব সহিত তাবা ধান বপন কবে। শীঘ্র ফসল পাবাব জন্য ধান বপন ক বতে তাবা মা লক্ষ্মীব নিকট প্রার্থনা কবে যেন ভাল ফসল হয। সে ফসল যেন ইঁদুবে না কাটে। মা লক্ষ্মীই যেন তাদেব শিশু পুত্র-কন্যাদেব বাঁচিযে বাখে সে প্রার্থনাও তাবা জানায সঙ্গীতেব মাধমে ঃ —

" ইযাগ্নি দা কৃংলা বাচাংনি চেম্বাই না আব
মাই ফাইমানি নাংছি দিবা যত্ তন মা ফুবয'
বেতি মাননানি দাইদি ফাইদি আমা লক্ষ্মী
ন ছাছে ছাদি
আইছ আই ছবাই তা অংছি ছিদি
' সিওচা মান্দাই তা চাছিদি আমা লক্ষ্মী
মা বাছা কুতুই ন নুংছে পালক ছিদি।

আবম্ভ হয ধান কাটাব গান "মাই বাক্ষনি"। ওগো মা লক্ষ্মী। তুমিই আমাদেব বক্ষা কব। তোমাকে মুবগী বলি দিযা পূজা দিব। ইহাই আমাদেব জাতীয প্রথা। অপচয না কবে সকলে ধান কেটে নাও। এব পব সে ধান দিযে খাবা ভর্ত্তি কব কাবণ শীঘ্রই ঘবে ফিবতে হবে। সঙ্গীত আবম্ভ হয।

ঐস্যা লক্ষ্মী মা নুংছে পালাই নাই
তক্মা তুই নাং বাই নন্ চামুংছে বিনাই
কাহাম ছে মাই বাছক ছিদি,
আথব পাথাব তা ছিপ ছিদি
আবছে তাবুক পজা খাদি, দাক্তি পাডাবঅ ছগই নাই।

ঘবে ঘবে নবান্ন হয। মা লক্ষ্মীকে বন্দনা কবে। মা তুমিই আমাদেব ধান চালেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তোমাব কৃপাতেই আমাদেব পাচুই মদ তৈবী হয। সে মদ আমবা পান ও আহাব কবি। তোমাব কৃপাতেই আমবা বেঁচে আছি। আমবা ভাল মন্দেব কিছুই বুঝিনা।

তোমাকে নিযেই আমাদেব ঘব সংসাব। আজ সবাই এসে একত্র হও, আজ নবান্নব উৎসব হবে।

তারপব তারা " মাইমি কাতাহ চামানি"(নবান্নর গান) গাইতে সুরু করে —

" আমা মাইনুমা, মাইনিনি রাজামা

চুয়াক্ তুই চা ফিনাই আনুংছে জাতি খুলুম নাই

কাহাম কছিয়া হামিয়া কছিয়া ন উক তু'মইন চুং ত নাই ।

অকরা চাক্রা রগ যত্ত খুলুম ফাইদি ইহা কাতাল চালাই ।

সর্ব্বশেষে তারা ধনের অধিপতি গণেশকে ও লক্ষ্মীকে পূজা দেয় । ইহাই তাদের গড়িয়া পূজা। সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে তারা প্রার্থনা করে ।

গড়িয়ানি শিঙ্গারো আমা মাহলুমা

গড়িয়া রাজা দেশ বেড়াইঅ

চাব চাপাইয়া নুংবু নুংইয়া

গাংলে খাক্লু চা, চুয়াকতুই নুংদে চেপ,

গালাছে নুংদে চেপ

দানাদান মা কবতমা, গ্রেচুং তাং গ্রে চুংমা।

ত্রিপুরা ও পুর্ববাংলার ভাষা ও সাহিত্যের সমন্বয়

ভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকে পূর্ব বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ অচ্ছেদ্য। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ। বাংলা বা বঙ্গ কথাটির পরিবর্তে বহুকাল " প্রাকৃত " ও " ভাষা " কথাটি ব্যবহৃত হত। আবার "প্রাকৃত ও ভাষা কথার স্থানে "গৌড়ীয় ও বঙ্গ শব্দ দু'টির ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বহুবার বহুস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। মাগধী অপভ্রংশ হতে আগত ও ত্রিপুরার রাজমালার বর্ণিত "সুভাষা" খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর বাংলা ভাষা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। বাংলা ভাষার একটি ধারা প্রাচীন বঙ্গের পট্টিকেরা (কুমিল্লা) চট্টগ্রাম আরাকান হয়ে সুদূর ব্রহ্মে ও বর্হিভারতে যায়। বঙ্গ ও পৌন্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তি থেকে বিশেষ করে ঢাকা ময়মনসিংহ ত্রিপুরার অঞ্চল দিয়ে এ সভ্যতার ধারা সূর্য উপত্যকার পথে শ্রীহট্ট কাছাড় মণিপুরের দিকে বিস্তৃত হয়। পরে তাহা ত্রিপুরা নোয়াখালী চট্টগ্রামেও গিয়ে পৌঁছে। যদিও এ সংস্কৃতি একই খাতে একখানে দেখা দেয়নি। তুর্ক বিজয়ের পর বাংলার এ সংস্কৃতি এখানে ওখানে দেখা যায়। আবিষ্কৃত মুদ্রা থেকেও জানা যায়, দলুতা দেবের মুদ্রায় খ্রীষ্টীয় (১৪১৬ — ১৪১৮) চন্ডীচরণ পরায়ন ' কামাক্ষ্যা কামরূপের নর নারায়ণ শ্রীশ্রীশিবচরণ কমল মধুকর, কাছাড়ের যশোনারায়ণ (১৮৫৩খৃঃ) হর গৌরী চরণ পরায়ন জয়ন্তীপুরের লক্ষ্মীনারয়ণ(খ্রীঃ১৬১৯ সে হিসাবে দেখা যায় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে কিরাত সংস্কৃতি প্রায় সবখানেই প্রভাব বিস্তার করে। শাক্তদের ক্রিয়া কান্ডের সঙ্গে এদের কখনো পশুবলির নরবলির সাদৃশ্য খোঁজে পাওয়া যায়। কখনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পাশাপাশি সসম্মানে টিকে আছেন। চন্তাই দেওয়াই প্রভৃতি তার প্রমাণ। এভাবে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি ধারার সৃষ্টি হয় — তাকেই বলা হয় হিন্দু মঙ্গোলয়েডকৃতি। এ সংস্কৃতির প্রধান বাহন হলেন বাঙ্গালী, ব্রাহ্মণ, নেপালের বৌদ্ধ তান্ত্রিক নাথ গুরুরা। এসব জাতির মধ্যে বাংলা ভাষা একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এবং বাংলা ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি ক্ষেত্র হিসাবে ষোড়শ সপ্তদশ শতকে গণনীয় হয় প্রধানত কোচবিহার, ত্রিপুরা ও আরাকান।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের অনেকেই চীন তিব্বতী বর্গের উপভাষা ব্যবহার করেন। চাকমা ভাষা পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলিত থাকলেও (চাকমা লিপিও আছে)। ত্রিপুরার চাক্‌মারা বাংলাই ব্যবহার করেন। চাক্‌মারাজ নলিনাক্ষরায় বিয়ে করে ছিলেন ব্রহ্মানন্দকেশব সেনের পৌত্রি বিনিতা রায়কে। ত্রিপুরার লোক সংখ্যা বেশ একটা বড় অংশই হল বাঙ্গালী। এসব বাঙ্গালীরা পূর্ব বাংলার উপভাষাই বেশী ব্যবহার করেন। আঞ্চলিক ভাষায় শ্রীহট্ট ও দক্ষিণ ত্রিপুরার ভাষায় চট্টগ্রাম নোয়াখালীর প্রভাব দৃষ্ট হয়।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ত্রিপুরার সঙ্গে পূর্ববাংলার সম্পর্কের আভাষ মেলে। আদিযুগ থেকেই প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে নাথ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। তারা তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতে সাধনা করতেন, এসব তান্ত্রিক বৌদ্ধ পাঠকদের উপদেশ বাংলা ভাষায় দেয়া হত। এবং সে গুলি দোহা বা ছড়ার আকারে ব্যক্ত হত। নাথ সম্প্রদায়ে প্রথম প্রবর্তক মীননাথের জীবন অবলম্বন করে 'মীনচেতন' নামে একটি কাব্য রচিত হয়েছিল। তা পূর্ববাংলার ত্রিপুরা জেলার ময়নামতীতে আবিষ্কৃত হয়েছিল 'ময়নামতীর গান' নামে অপর একটি কাব্যও বাংলা দেশে রচিত হয়েছিল। ময়নামতীর গানে মীননাথ সম্পর্কে যে কথা আছে মীনচেতনায়ও সে কথারই আভাষ মেলে। 'ময়নামতীর' গানে গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যপাট মেহেরকুলে ছিল সে কথার উল্লেখ আছে। মেহেরকুল পাটিকারাতে গোপীচাঁদের রাজ্য ছিল সে কথারও উল্লেখ্য আছে।

কোন পুস্তক পুস্তকে পাটিকারার নাম উল্লেখ আছে। সুকুর মহম্মদ মুকুল লিখেছেন । রঙপুরের গোবিন্দচন্দ্রের গাথাগুলিতে শুধু বঙ্গ বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে বঙ্গ বলতে পূর্বাঞ্চলকেই বুঝাত। এরূপ গোপীচাঁদের মূলস্থান যখন ত্রিপুরা বলে প্রমাণ হয়েছে তখন গোপীচাঁদের গান প্রথমেই ত্রিপুরাতে গীত হবে সেটাই স্বাভাবিক, ময়ননামতীতে যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তারই প্রভাব দেখা যায় রংপুরের মানিকচাঁদের গানে, গোবিন্দচন্দ্রের গীতে, কামরূপের শিবের গীত এমন কি বৌদ্ধ কাব্য "ধর্মমংগল" পর্য্যন্ত ময়নামতীর গানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বনে 'রাজমালা' রচিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এর রচনাকাল। ময়নামতীর গানের ন্যায় এর প্রচার ততটা হয়নি বা বাংলা সাহিত্যের উপরও খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবু ও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর মূল্য কম নয়। রাজমালায় বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের সংমিশ্রণ হয়েছে। বিপুল বাংলা সাহিত্যের মধ্যে 'রাজমালা' ও ময়নামতীর গান সর্বত্র যেরূপ সমাদৃত হয়েছে তাতে ত্রিপুরাবাসী গৌরবান্বিত। গোপীচাঁদ ত্রিপুরার মেহেরকুল পাটিকারার রাজা ছিলেন। সুতরাং গোপীচাঁদ ত্রিপুরার আপন লোক।

ত্রিপুরা পূর্ববাংলার সংস্কৃতি সমন্বয়ের আর একটা দিক হল পুঁথিচর্চা। সে যুগে ত্রিপুরা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার পুঁথিচর্চাও পুঁথি রচনাকারীগণ বাংলা ভাষায় পুঁথিচর্চার মাধ্যমে ত্রিপুরা আর বাংলার মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সেদিক থেকে বলা যায় মহারাজ - রাজধব মাণিক্যের আদেশে বামগঙ্গা বিশারদ 'কৃষ্ণমালা' রচনা করেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের আমলে নোয়াখালীর দক্ষিণ দিকবাসী কবি মনোহর আলি "গাজীনামা" পুঁথি রচনা করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের আমলে গ্রাম্য কবি মহিউদ্দিন ' চম্পক বিজয়' রচনা করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বরদাখাত পরগনার রোয়াচালা গ্রামের নন্দ কিশোর শর্মা " বরদামঙ্গল" পুঁথিটি রচনা করেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের সময়ে ফেনী নিবাসী কবিচন্দ্র দাস " গোরক্ষ বিজয় " পুঁথি রচনা করেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার বাক্‌সার গ্রামের শেখচান্দ "রসুল বিজয়" পুঁথি রচনা করেন। তারপর আমবা যে সব পুঁথির সন্ধান পেয়েছি তার মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য রতিদেবের " মৃগলুব্ধ" (১৮০৩ খৃঃ)। এজিদের পুরীলুট (১৮০৬খৃঃ), মুছা পয়গম্বরের কিচ্ছা। (১৮০৬ খৃঃ), পন্ডিত ভবানীনাথের' শ্রীরামচন্দ্রাভিষেক দিগ্বিজয় (১৮০৮ খৃঃ) সহবন্ধু দাসের " রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন (১৮১২খৃঃ) সঞ্জয়ের "কন্টকপর্ব" (১৮১৪ খৃঃ। আবদুল রহিমের " সাহামাদারের নিকট সাহা " ছালেকের ছওয়াল (১৮১৭খৃঃ) গঙ্গাদাস সেনের " মহাভারতে বিবেকের যুদ্ধ ' (১৮২০ খৃঃ) ভবানীদাসের " নৌকাখন্ড" (১৮৩৩ খৃঃ) দ্বিজরামকৃষ্ণের ' জ্ঞানচৌতিশা (১৮৩৩ খৃঃ) আবদুল হাকিমের ' সহরনামা' (১৮৩৬খৃঃ) গুণরাজখানের ' গোবিন্দবিজয় ' (১৮৩৭খৃঃ) মোহাম্মদ আকবরের " জেবল মুল্লুক সামা রোক"(১৮৪২খৃঃ) দ্বিজ কানাই চন্দ্রের 'যথগীত্য'(১৮৪৪খৃঃ) মহম্মদ খানের ' কেয়ামত নামা দজ্জাল নিপাত (১৮৪৬খৃঃ) শেখসাদীর 'গদামল্লিক' (১৮৫০খৃঃ) গবীর ফকিরের ইউসুফ জোলেখার পুস্তক (১৮৫৪ খৃঃ) সঞ্জয়ের ' উদ্দোগপর্ব' (১৮৬১খৃঃ) মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের " লালমতী পুস্তক" (১৮৭০ খৃঃ) মোহাম্মদ রাজাকের 'ছয়ফুল মুল্লুক ও লালমতী' (১৮৮১খৃঃ)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উপরিল্লিখিত পুঁথি রচয়িতা অধিকাংশই সেদিন ত্রিপুরা মহারাজাদের অধীনে ত্রিপুরায় বাস করতেন এবং প্রিত্যেক পুঁথি রচয়িতা পুঁথিতে অব্দ হিসাবে ত্রিপুরাব্দ ব্যবহার করেন। তাতে স্বাভাবিক ভাবেই বলা যেতে পারে ত্রিপুরা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়ও তাঁদের প্রতি গভীর নিদর্শন স্বরূপ বা বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতির বন্ধন অনেকদিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্য ও পূর্ববাংলার কবিগণ উভয়ের মধ্যে একটা সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ গড়ে তোলেন। নামের সঙ্গে চটগ্রামের সপাটিয়া গ্রামের কবি ও শ্রীহট্টের বালাগঞ্জ থানার ফকির ভেলা শাহ, একজন বৈষ্ণব কবির নামও

উল্লেখ্য। উভয়েই এই ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে ত্রিপুর দরবারে থেকে বাংলা ভাষায় বহু বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেছেন।

সংবাদপত্রের দিক থেকেও পূর্ববাংলা ও ত্রিপুরার সম্পর্ক ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই। ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন সংবাদপত্র বের হয়নি। তার প্রধান কারণ ছিল বে-সরকারী কোন ছাপাখানা এখানে ছিল না। তাই সেদিন ত্রিপুরার লেখা পূর্ববাংলার ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালীর পত্রিকায় ছাপা হত। বলা বাহুল্য এ সব সংবাদপত্রগুলিকে ত্রিপুরাব রাজন্যবর্গ পরোক্ষভাবে সাহায্য করতেন। মহারাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্যেব রাজত্বের সময়ে তাঁর পৃষ্টা পোষকতায় ত্রিপুরা জ্ঞান প্রসারিণী সভা হতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জ্ঞান প্রসারণী মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। তারও পূর্ব্বে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা থেকে গুরু দয়াল সিংহের সম্পাদনায় ত্রিপুরা হিতৈষী পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, ঢাকা থেকে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশিত হয়। 'ঢাকা প্রকাশে' বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বহু খবর উঠেছে। ঈশান চন্দ্র মাণিক্যের প্রত্যক্ষ সাহায্যে ঢাকা থেকে সে সময় 'ঢাকা বার্ত্তা' প্রকাশিত ও 'চিত্ত রঞ্জিকা' দুটি সংবাদ পত্র প্রকাশের কথা জানা যায়। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা থেকে দর্পণ ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পল্লীবিজ্ঞান দুটি মাসিক পত্র প্রকাশ হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পাক্ষিক 'ত্রিপুরা বার্তাবহ' কুমিল্লা সিংহ প্রেসে ললিত মোহন চক্রবর্তীর দ্বারা প্রকাশিত হয়। বীরচন্দ্র মাণিক্য স্বয়ং এ পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ পত্রিকা পাঠে জানা যায় সে সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রদের জন্য ১০ টাকা হারে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে 'মহারাজা স্কলারশিপ' দেয়া হত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে রামকানাই দত্ত মহোদয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে 'উষা মাসিক' ও 'সন্তান' পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন। ত্রিপুবা জেলার গৌতম পাড়ার শশীভূষন দত্ত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে 'ঢাকা' গেজেট পত্রিকা' এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রজনীনাথ নন্দী ও ভগবান চন্দ্র সেন যথাক্রমে 'প্রতিনিধি' ও 'হীরা' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নীলকমল দত্ত 'হিতবার্তা' সম্পাদনা করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের সময় কুমিল্লা থেকে সাপ্তাহিক 'ত্রিপুরা গাইড' এবং শ্রীহট্ট থেকে "শ্রীভূমি" প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ খৃঃ ত্রিপুরা জেলার চুন্টা গ্রাম নিবাসী অপূর্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় 'চুন্টাপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। (এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা থেকে ভূপেন্দ্র নাথ মোর সম্পাদনায় 'ত্রিপুরালক্ষ্মী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

পবিশেষে বলা যায় যে রত্নমাণিক্যের রাজত্ব সময়ের সংস্কার উদ্যোগের পর থেকে বীরচন্দ্র রাধা কিশোরের সংস্কারমূলক কার্যাবিলীর সময় পর্য্যন্ত বাংলার নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ও বাংলার উভয় স্থানের সাংস্কৃতিক সমন্বয় দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত বহু পূর্বেই শুরু হয়ে ছিল সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আজ একথা বললে ভুল হবে না যে বাংলাদেশ হতে ত্রিপুরা জেলার লালামাই ময়নামতী অঞ্চলের মধ্যদিয়ে বর্তমান সিলেট কাছাড়ের ভিতর দিয়ে লুসাই পাহাড় অতিক্রম করে মনিপুর হয়ে উত্তর ব্রহ্মদেশের উপর দিয়ে ব্রহ্মদেশের পাগান পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি স্থলপথের যে উল্লেখ আছে সে স্থল পথটি শুধুমাত্র বাণিজ্য আদান প্রদানের কাজেই ব্যবহৃত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের যোগসূত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এসব হতে ইতিহাসের নানা বিচিত্র উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে বাংলায় তথা পূর্ববাংলা ও ত্রিপুরার মানস লোক একাত্ম হয়ে গেছে রাষ্ট্রসীমার সঙ্কীর্ণ গন্ডী অতিক্রম করে ত্রিপুরা ও পূর্ব বাংলা নিকটতম হয়েছে।

কিরাতিয়ার উদ্ভব, বিস্তার ও অবস্থানের ইতিবৃত্ত

বর্তমান নেপালের পাহাড়ী অঞ্চলকে পূর্বে ' কিরাতদেশ' বলা হত । পরবর্তী কালে নেপালের পূর্বদিকের অঞ্চলকে ' মধ্যকিরাত' ও ' ওপারের কিরাত' বলা হত । দু প্রদেশের কিরাতিরা নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে এসে বাস করতো । পরে নিজেদের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় কেউ উত্তরে কেউ পূর্বে চলে যায় । পূর্বে এ বংশের নামছিল 'সৌমর বংশ' । এ 'সৌমর বংশ' বিশেষ কোন জায়গা থেকে কোন শতাব্দীতে এসে ভারতবর্ষে বাস করতে আরম্ভ করে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে ।

Sir Jhon Hammerton এর লেখা The Practical Knowledge বইয়ের Ancient history নামক প্রবন্ধে বলেছেন 'খৃষ্টীয় ৪০০০ (চার হাজার) অব্দ পূর্বে মিশরে যখন 'স্নেক' রাজারা প্রথম পিরামিড তৈরী করেছিল তখন পারস্যের উত্তরে সমতল ভূমিতে দু'রকম সভ্যজাতি রাস করত । উত্তর দিকে যারা বাস করতো তাদের বলা হতো ' সকাদ বংশ' আর দক্ষিণ দিকে যারা বাস করতো তাদেব বলা হতো 'সৌমর বংশ' । সৌমর অর্থ হচ্ছে যারা যুদ্ধে শত্রুর সামনে হাসতে হাসতে প্রাণ ত্যাগ করে। এঁদের নিজেদের শহর ছিল । প্রত্যেক শহরে একজন করে রাজা থাকতো। এঁরা সেচ প্রণালীব দ্বারা চাষ বাস করতে, জানতো বড়বড় পাহাড়ের গায়ে এরা নিজেদের আইন কানুন লিখে রাখতো। যুদ্ধের পব সন্ধি হলে সন্ধির সর্তাবলী শিলাস্তম্ভে লিখে দু'গাঁয়ের মাঝে পুতেঁ রাখতো । গ্রাম কাবও অধীনে থাকতে চাইতো না। এ ভাবে রাতদিন ঝগড়া চলতে থাকায়, যাঁরা এ সব পছন্দ করতো না লড়াইয়ে হেবে যেত, তাঁরাই বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র কেউ পূর্বে কেউ পশ্চিমে চলে যেত । এদেরই একদল খৃষ্টপূর্ব ৩০০০(তিন হাজার) অব্দে চীনে এসে রাজ্য স্থাপন করে । এঁদের অন্য আর এক শাখা কাবুল পাঞ্জাব হয়ে গঙ্গা নদীর সমতল ক্ষেত্রে বাস করতে আরম্ভ করে। কয়েক পুরুষ পরে আর্যরা এ ' সৌমর বংশ' কেই ' কিরাত বংশ ' বলে অভিহিত করে । মহাভারতে এর সমর্থন মেলে ।

মিঃ পার্সিভাল লন্ডন (Percival London) বলেছেন, কিরাতিয়া দ্বাপর যুগ যখন ১৫০০০ (পনের হাজার) বৎসর চলে যায় তখন এসে এরা নেপালে রাজ্য করতে থাকে ।

পন্ডিত অম্বিকা প্রসাদ উপ্যাধ্যায় বলেছেন কিরাতিরা পশ্চিম দিক থেকে এসে নেপাল আক্রমণ করে রাজ্য জয় করে শাসন কার্য্য করতে লাগলেন ।

'যোগিনী তন্ত্রে' আছে —— ' কুশদ্বীপ' থেকে আসা ' কংকতি' নামে এক পরমা সুন্দরী কুমারীর সাথে মহাদেবের সংসর্গ হওয়ায় এক পুত্র জন্ম নেয় । সে ছেলে ব্যাধ বৃত্তি করতো বলে তার উপাধি দেয়া হল ' কিরাত'। এই কিরাত বংশের ২৮ পুরুষ পরে এ বংশের নাম হয় ' সৌমর' । এ সৌমর বংশ থেকেই ' কুবাচ' বা 'কোচ' পল্লব যৌবন পুলিন্দ ইত্যাদি শাখা বেরিয়ে আসে । সৌমর জাতির রাজ্য কামরূপে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । কুশ দ্বীপ বর্তমানে কাবুলের উত্তরদিকে আছে ।

' সৌমর' বংশের বা কিরাতীদের নিয়ম অনুসারে এরা তিন দিক থেকে এসে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে

বাস করতে থাকে। পশ্চিম দিক থেকে যারা এসেছিল তাদের বলা হতো 'কাশী বংশ। পূর্ব দিক থেকে যারা এসেছিল তদের বলা হতো 'তাই শ্যাখ বংশ'। আর উত্তর দিক থেকে যারা এসেছিল তাদের বলা হতো লাশা বংশ।

কাশী বংশ 'মুনাতেম্বে' নামক জায়গা থেকে এসে বর্তমানে পারস্যের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে বাস করে খৃষ্ট পূর্ব ১৫৭০ অব্দে। এই কাশী বংশের বোধিলা রাজা বোধথন দেশ অধিকার করে। এরপর খৃষ্ট পূর্ব ১৩০০ অব্দে ইলাম বংশের রাজা কাশী বংশের রাজাকে যুদ্ধে জয় করে তাড়িয়ে দেয়। তখন কাশী বংশরা পূর্ব দিকে চলে আসে। এবং তারা আফগানিস্থানের 'গোলকু' নামক জায়গায় বাস করতে লাগল। এখানে এসে তাদের নেতা নাম দেবের মৃত্যুর পর এ বংশ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পবে কাশী বংশ গঙ্গা ও যমুনার সমতলে ভূমিতে এসে ১১ পুরুষ পর্যন্ত বাস করে। এরপর তাঁদের আর এক শাখা উত্তরে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে জঙ্গল সাফ কবে এক গ্রাম পত্তন করে বাস করতে থাকে। গ্রামের নাম দেয় 'সিমাঙগড়'।

খৃষ্টপূর্ব ১০০০ (এক হাজার) বৎসর পূর্ব থেকেই কাশীবংশের লোকেরা হিমালয়ের তবাই অঞ্চলে বাস করতে শুরু করে এবং বারটা গ্রাম স্থাপন করে। সে গ্রামগুলির একত্রে নাম দেয়া হয়েছিল 'বারহগড়ী'। 'সিমাঙগড়' ছিল এদেব কেন্দ্র। কিরাতী ভাষায় সিমাঙগড়েব অর্থ হল 'প্রথম দেবতা'। এঁদের বংশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় 'লোহচন্দ' এবং 'মহাচন্দ' রাজপুরোহিতের আদেশ নিয়ে 'ডিটো' এবং 'পূঠান' এ রাজ্য স্থাপন কবে।

খৃষ্ট পূর্ব ৮০০ অব্দে 'এলাম্বর' উত্তর দিকে গিয়ে নেপালে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। 'অভিমল' নামে এক বীর পাম্পাইতে এবং খিমর্চি সুনা কোশ নদীর তীরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তখন 'লুকথুও' সিমাঙগড় থেকে আর এক শাখা 'সুনা কোশ নদীর পার 'মোরঙ' নামক স্থানে চলে এল। সে সময় তরাই অঞ্চলে বাস করত মেচ, কোচ, ধিমাল বংশের লোকেরা। এখান থেকে তাঁদের আর এক শাখা যারা 'কেদাপ' পাহাড়ে এসে বসবাস করতে লাগল তাঁদেরকে বলা হত 'ভাইকুট্টা' বংশ। অন্য আর একটি শাখা 'ইলাম' পাহাড়ে থাকত যাদেব বলা হত 'ইমে' বংশ। অপর আর এক শাখা 'খবালুঙ' 'বাবা' 'লিখু' ইত্যাদি স্থানে বাস করতো তাদের বলা হতো 'বারাবোম্ভা' বংশ। এ ভাবে পশ্চিম দোটি থেকে পূর্বে 'ইলাম' পর্যন্ত স্থানজুড়ে কাশী বংশবা বাস করতে থাকে। এবংশকে 'কিরাত বংশাবলীতে' 'থামবোম্বা' বলা হতো।

Prof H. A giles বলেছেন, খৃষ্ট পূর্ব ২৬৯৮ অব্দে বিদেশ থেকে এক বংশ এসে চীনে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এদের প্রত্যেক গ্রামে রাজ্য থাকতো। খৃষ্ট পূর্ব ২২০০ অব্দে গ্রামগুলির মধ্যে 'ফুঙচাও' 'কেচাও' 'সুনচাও' 'রৈন চাও' 'চিন চাও' 'যুও চাও' 'য়াংচাও' 'তাই চাও' প্রসিদ্ধ ছিল। তাই বংশের রাজারা শ্যাম দেশে এসে বাজ্য স্থাপন করে। দেশের নাম রাখে 'তাইলেন্ড' বর্ত্তমানে তার নাম 'থাইল্যান্ড'। যারা আরও পশ্চিমে এসে উত্তর বার্মার 'নাখাও' নামক স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করে বাস করতেছিল। তারা নিজেদের 'তাই শ্যামন' বংশ বলে পরিচয় দেয়। তাদের প্রথম রাজার নাম 'পোংসেহাঙ্গ'।

'নাখোও' থেকে এক শাখা ' পাতজোই' পর্বত পার হয়ে ব্রহ্মপুত্রের সমতল ভূমিতে ' তাইরোং' নামক এক গ্রাম স্থাপন করে । বর্তমানে সেখানের নাম ' দারোঙ' বা ' দারাঙ ' বলা হয় ।

অন্য আর একটি দল নিজেদের ' মকত্তান' বংশ বলে পরিচয় দেয় । তারা আরও পশ্চিমে এসে আসামে পৌঁছায় । সেখান থেকে আরও পশ্চিমে এসে উত্তর পাহাড় অঞ্চলে গ্রাম স্থাপন করে, নাম দেয় ' শ্যানপুর ' । বর্তমানে এর নাম ' চেনপুর ' ।এটি নেপালে অবস্থিত ।এখানে থেকে অপর এক দল আরও পশ্চিমে গিয়ে কাশীবংশদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে একই বংশ হয়ে যায় ।

মহাভারতে আছে যে 'সৌমর বংশের' কিরাতীরা অনেক কাল আগে থেকেই কামরূপে রাজ্য শাসন করতো ।এরপর আর্যরা আসার সময় নরকাসুর এদের তাড়িয়ে সমুদ্র পার করে দেয় । কিন্তু কিরাত বংশাবলীতে আছে সে এরা উত্তর পূর্ব দিকে গিয়ে পূর্ব তিব্বতে 'থামমিন্যা নামক জায়গায় বসবাস করতে থাকে । অনেক বছর পরে এর আরেকদল মধ্য তিব্বতে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করে। এদের রাজা ছিল ' মুনাকেনহাঙ্গ' ওখানে গিয়ে তার এক পুত্র হয় লাসাহাঙ্গ এর নাম ছিল ' লাসাহাঙ্গ' পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন । তাঁর দুই পুত্র ছিল। নাম তাদের ছিলো ' উপহাঙ্গ' ও 'চ্যাংবাহঙ্গ' । পিতার মৃতুর পর প্রজারা ছোট ছেলে ' চ্যাংবাহাঙ্গ'কে রাজা করল । উপহাঙ্গ বড় ছেলে হিসাবে ছোট ভাইয়ের অধীনে থাকা অপমানজনক মনে করে নিজের অনুচরবর্গ নিয়ে দক্ষিণ দিকে এসে নেপালের ' তাপথিংজোঙ্গ ' নামক স্থানে এসে বসবাস করতে লাগল । প্রথমে কাশী বংশ কিরাতদের সঙ্গে একটু আধটু ঝগড়া ঝাটি হলেও পরবর্তী সময়ে বিবাহাদি দ্বারা উভয় বংশের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠে । উপাহাঙ্গ নিজেদের লামা বংশ বলে পরিচয় দেয় । উপাহাঙ্গ প্রতিবেশী রাজাদের ' ঋগবেদের ' শিক্ষা দেন । উপাহঙ্গের ছয় পুরুষ পরে আরেক দল তিব্বতের চাং প্রদেশ থেকে এসে পূর্ব নেপালে বসবাস করতে লাগল । এরপর এদল সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে কেউ পূর্ব দিকে সিকিমের দবমাদন দেবাপ থেকে লোচন লাচুং পর্যন্ত্য জায়গা জুড়ে বাস করতে থাকে। এরাও নিজেদের থেকে এসে মিশ্রণ হয়ে এক নুতন জাতির সৃষ্টি হয় । মহাভারতে এ সম্পর্কে আছে যে হিমালয়ের পশ্চিমাংশকে বলা হত গন্ধমাদন পর্ব্বত ।আর পূর্ব অংশকে বলা হত ইন্দ্রকীল পর্বত ।এসব স্থানে কম্বোজ, যবন,শক, পাবদ, পল্লব, চিনিয়া, কিরাতী, দরদ, নাগ , সৌমর, ফস, বৃহদবল, এবং পৌন্ডবক জাতিরা বাস করতো । এ সব জাতিরা সভ্য এবং শক্তিশালী ছিল । পান্ডবেরা এদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছিল। এ সব জাতিরা পূর্ণ ক্ষাত্রগুণ সম্পন্ন ছিলো --- পান্ডবেরা এ কথা স্বীকার করেছেন । মহাদেবের অনুচর যক্ষ, কিন্নর গার্ন্ধব প্রভৃতি কিরাতিদের উল্লেখ পাওয়া যায় । এ জন্য উপরোক্ত মহাভারতীয় বংশরা ' কাশী' ' তাইশ্যান ' ওলামা বংশধরেরা কিরাতিদের বংশধর বলে প্রমাণ করা যায় ।

সিমাঙর থেকে যে সব সৌমর কিরাতিরা রাজ্য স্থাপন করেছিলো তাঁদের মধ্যে ' পাম্পা' 'নেপাল' ' কেদান' এবং মোরঙ প্রসিদ্ধ ছিল । এসব রাজ্যের কয়েকটির সম্পর্কে জানা যায় ।

নেপাল ঃ -- সিমাঙর থেকে সৌমর বংশের কিরাতির নেতা ' য়েলাম্বর' নেপালের গোপাল বংশের রাজা যক্ষগুপ্তকে পারাজিত করে নিজে সেখানকার রাজা হন । ' য়েলাম্বর' নিজে ' কিরাতীশ্বর মহাদেব' বলে নিজের পদবী নেন। য়েলাম্বরের (সাত) পুরুষ পরে ' হুমতি' কিরাত রাজ্যে রাজা হন এই রাজার

রাজ্যকালে পঞ্চপান্ডবেরা বনবাসে আসে। কিরাতরূপ ধরে অর্জুন মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করে বর পান। এ সময় পশ্চিম দিকে কিরাত বংশের ‘সুবাহু’ ও ‘পুলিন্দ রাজা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পঞ্চ পান্ডবেরা বনবাসের সময় সর্ব প্রথম এই সুবাহু ও পুলিন্দের অতিথি হয়েছিলেন। মহাভারতে এ কথার সমর্থন মেলে। মহাভারতের যুদ্ধের সময় পান্ডব পক্ষ নিয়ে যে সব কিরাতি রাজারা লড়েছিল তাদের মধ্যে ‘জিতেজস্তি’ ‘কম্বোজ’, ‘বৃহদল’ ‘ঘটোৎকচ’ ‘বিরাট’ এবং ‘সত্য’ রাজারাই ছিল প্রধান। বহু পুরুষ পরে নেপালে ‘জিতেদস্তি’ রাজা হলেন। এ রাজার রাজ্যকালে গৌতম বুদ্ধ নেপালে এসে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তখন থেকে কিরাতিরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব ৫২০ অব্দে সৌমর বংশের কিরাতিরা বৌদ্ধ মত গ্রহণ করে বলা যায়। ‘জিতেদস্তির’তিনপুরুষ পরে নেপালে ‘স্তংসি’ কিরাত রাজা হন। তার সময়ে অশোক তীর্থ যাত্রার জন্য এসেছিলেন।

কেদাপ ঃ সিমাঙগড় থেকে লুকথুফের নেতৃত্বে একদল — ‘কেদাপ’ পাহাড় এসে বাস করতে থাকে। এঁদের রাজার নাম ছিল ‘ভাই কুট্টহাঙ্গ’ ভাই কুট্টহাঙ্গের ৯ (নয়) পুরুষ পরে এ বংশে দিতে নামক রাজা হন। এরপর তার পুত্র পর্বত রাজা হন। ইনি নন্দ রাজাদের সমকালীন ছিলেন। চাণক্য এই পর্বত রাজার সাহায্য নিয়েছিলেন। শর্তানুসারে মগধের উত্তর পূর্বভাগ কিরাতিয়ারা পেয়েছিলো। চন্দ্রগুপ্ত কিরাতি ফৌজের সাহায্যে পাঞ্জাব বিজয় করে নিয়ে রাজ্য সীমা সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন।

মোরঙ ঃ সিমাঙগড় থেকে ‘বিযুগ’ নদী পার হয়ে ‘সুনকোশ’ নদীও পার হয়ে মোরোঙের জঙ্গল সাফ করে যে সর্ব প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন তাঁর নাম ছিল ‘হবাহাঙ্গ’। কৃষক পুরুষ পরে ‘কোচহাজো’ রাজা হন। ইনি নিজ রাজ্যের মোরঙ থেকে দক্ষিণে বিহার ও পূর্ব্বে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তার করেন। কোচ হাজোর দুটি পুত্র ছিল সত্য ও কিচক। সত্য রাজার রাজত্ব কালে কিরাতি সভ্যতা সর্বোচ্চি শিখরে আরোহন করেছিল মহাভারত তাব সাক্ষ্য দেয।

মোরঙ থেকে যারাপূর্ব দিকে যায় তারা হল বোরো কাছাড়ি, লালঙ, দিমাশা, হোজাইক, ইত্যাদিরা। দিমাশার বিষয়ে এরূপ লেখা আছে যে পান্ডব পুত্র ভীম সেন কিরাত রাজার বোন হিড়িম্বাকে গন্ধমাদন পর্বতে আসার সময় বিবাহ করেন। তার ঘটোৎকচ নামে এক বীর পুত্র হয়। ‘ঘটোৎচক’ নিজের মার নামে বংশের নাম রাখে। কযেক বৎসর পব এই বংশ ‘হিড়িম্বাপুর’ নামে এক গ্রামের পত্তন করে। হিড়িম্বাপুরের অপভ্রংশ হিসাবে পরবর্তীকালে নাম হয় ডিমাপুর যা বর্তমানে আসামে অবস্থিত।

লেম্বুবান ঃ — তাই শ্যান বংশের লোকের পশ্চিমে এসে নেপালের উত্তর পূর্বে বাস করতে থাকে। তখন এই দলে দশজন দলপতি ছিল। এদের তিনজন পুরোহিত ছিল। এরা ডাক্তার ও ইতিহাসকারের কাজ করতো। নেপালের কেদাপ নামক জায়গায় এরা বাস করতো। কিন্তু রাজারা তাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করায় এরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে। তখন তারা সে দেশের নাম রাখে লিম্বুবান। লিম্বুবানের অর্থ কিরাতি ভাষায় হল ধর্নুবান দিয়ে যুদ্ধ করে যে দেশ জয় করা যায়। তারা নিজেরা কতগুলি আইন তৈরী করেছিল। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ-

রাজনৈতিক — ১) কোন রোজনৈতিক কাজে দশ ভাইয়ের পরামর্শ করতে হবে। ২) জনসংখ্যা কম হলে আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না বলে যে কোন জাত হলেও নিজেদের জাতে মিশিয়ে নিতে

হবে।৩) নিজের জাত অন্য জাতে গেলেও তাকে প্রায়শ্চিত করিয়ে ফিরিয়ে নিতে হবে।৪) নিজেদের মধ্যে কেউ অন্য জাতে বিবাহ করলে তাকে এবং তার ছেলে মেয়েকে নিজেদের মধ্যে নিতে হবে। ৫) প্রত্যেক পুত্রকে ১২ বৎসর থেকে ধনুর্বিদ্যা শিখতে হবে।৬) প্রত্যেক পরিবারের একজন পুত্র ১৮ বৎসর বয়স হলে সিপাহীতে নাম দিতে হবে। ৭) প্রত্যেক গ্রামে ৩০০ জন সিপাহীর উপর একজন সর্দার থাকতে হবে এবং সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। ৯) যে লোক সর্দার হবে সে রাজার কাছ থেকে জায়গীর পাবে।১০) বড় সর্দার নিজের প্রয়োজন মত জমি রেখে অধীন কর্মচারীদের ভাগ করে দিতে হবে। বড় সর্দারের অধস্তনদের উপর পুরো অধিকার থাকবে। ১১) উৎপাদনের ১০/১ ভাগ রাজাকে খাজনা দিতে হবে।১২) রাজ্য শাসন এক সভার দ্বারা পরিচালিত হবে। সভায় রাজা মন্ত্রী বড় সর্দাররা এবং সদস্যরা থাকবে। রাজ্যের সমস্ত কাজ এ সভার দ্বারা নিদের্শিত হবে।১৩) প্রাণের বদলে প্রাণ দিতে হবে। চোরের হাত ফুটন্ত জলে দিতে হবে। গায়ের খারাপ মেয়েকে মন্দিরে গিয়ে আর করবো না বলে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

সামাজিক নীতি ঃ— ১) পুত্র জন্মাবার চারদিন পরে, কন্যা জন্মাবার তিন দিন পরে নাম কর্ম বা ষষ্ঠি পত্র করতে হবে। ২) পুরুষ মারা যাবার চার দিন পরে, স্ত্রী মারা যাবার তিন দিন পরে শ্রাদ্ধ করতে হবে। ৩) যে পরিবারে মৃত্যু ঘটবে তাদের এক বছর ধরে নাচ গান করা নিষেধ, বিয়ে করা নিষেধ। পূজা পার্বণ করা নিষেধ।কোনরূপ অনুষ্ঠান করা যাবে না। ৪) বিয়ে দু'রকমে করতে পারবে। এক - সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান করে।

ধর্ম ঃ— ১) 'দশলিম্বারা একমূল' দেবীকে বৎসরে দু'বার পূজা দিতে হবে। কার্তিক ও বৈশাখ মাসে। ২) ফসল পাকার পর নবারের পূজা দিতে হবে।৩) স্ত্রী গর্ভবতী হলে শিশুর রক্ষার জন্য পূজা দিতে হবে।৪) বৎসরে একবার সকলের জন্য পূজা দিতে হবে। ৫) বৎসরে একবার 'তাপকেঙ' অথাৎ রক্ষার জন্য পূজা করতে হবে।

মারাঙ্গহাঙ্গ ঃ- খৃষ্টীয় ৫৪০ অব্দের পরে লামাবাশ 'মারাহাঙ্গ' নামক রাজা তাইশ্যান বংশের অর্থাৎ লিম্বুবান বংশের রাজাদের হারিয়ে নিজের রাজ্যসীমা মিথিলা পর্য্যন্ত বিস্তার করেন। মারাহাঙ্গ এক সময় তিব্বতের রাজা ছিলেন।মৈথিলী ভাষায় আছে যে রাজা হর্ষবাদ সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতকে রাজাকে অধীন মিথিলা গেল। 'তিব্বত বৌদ্ধধর্ম সহ দীক্ষিত ছিল'। 'তথাপি মিথিলা বৌদ্ধধর্ম মতাবলম্বী নহি ভেল।' অর্থাৎ রাজা হর্ষদেব সপ্তম শতাব্দীতে মিথিলা প্রদেশ তিব্বতের রাজার অধীনে ছিল। তিব্বত দেশের ধর্ম 'বৌদ্ধ' হলেও মিথিলা প্রদেশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলনা।

মারাংহাঙ্গ রাজ্যে শিক্ষা বিস্তার, বৌদ্ধধর্মের প্রচারে এবং ভারতের সাথে বাণিজ্য বিস্তার করেন। মারাংহাঙ্গের পরে মকওয়ানশ্যান রাজা হন।মিথিলা সে সময় বিদ্যার কেন্দ্র ছিল।তিনি মিথিলা থেকে পন্ডিত এনে কিরাত প্রদেশ শিক্ষার প্রচার করেন। মিথিলাতে সে সময় পড়ার আগে 'ওম নামা সিদ্ধম' বলে আরম্ভ করতে হত।মকওয়ানশ্যান মারাংহাঙ্গের দ্বারা প্রচলিত অনেক পুরানো আইন সংশোধন করেন।

মকওয়ানশ্যানের মৃত্যুর পর শ্রীজঙ্গাহাঙ্গ রাজা হন।অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা থিমেনদিশান

ভারতবর্ষ থেকে পন্ডিত পদ্মসম্ভব, শান্ত বক্ষিত মহাপন্ডিত বিমল মিত্র প্রভৃতিকে তিব্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীজঙ্গাহাঙ্গ তিব্বতে গিয়ে পন্ডিতদের থেকে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করে এসে কিবাত প্রদেশ জ্ঞান চর্চ্চার প্রচলন করেন। কিরাতের বিদ্বান পন্ডিতগণ তখন শ্রীজঙ্গমুঞ্জুম সাপ্লা' নামক বিখ্যাত পুস্তক লিখেছিলেন। জঙ্গাহাঙ্গ রাজ্যে অনেক পাঠশালা তৈরী করেছিলেন। কিরাতি সাহিত্যের 'সামলো সাপ্লা' নামক গ্রন্থে শ্রীজঙ্গাকে 'পদ্মসাগরের' অবতার বলে উল্লেখ রয়েছে। কিরাতিরা তন্ত্রকে খুব পছন্দ করত।

আগন্তুক ঃ— ভাবতবর্ষ থেকে নেপালেব 'পম্পা' প্রদেশে যে হিন্দুরা এসেছিলেন তাদের বিষয়ে জানা যায় যে যখন আর্ষরা 'পাম্পা' প্রদেশে আসতে আরম্ভ করে তখন কিরাতিরা হাতে ধনুর্বান নিয়ে গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকতো — হিন্দুর' চেঁচিযে চেঁচিয়ে বলতো 'হে কিরাত মহারাজ, আমরা দুঃখের মধ্যে পড়ে আপনাদের আশ্রয় চাচ্ছি, আমাদেব আশ্রয় দিন। তখন কিরাতির বেবিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করায় তাবা বলে যে যবনদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমরা আশ্রয় পেতে এসেছি। তখন কিরাতিবা নিজেদের রীতি নীতি আচার ব্যহাব জানিযে তাদের আশ্রয় দেয়। তখন বাস কবতে থাকে এবং ক্রমে হিন্দু ধর্মের প্রচার করে। এরপর এই দু'জাতির সংমিশ্রণে যে জাতির সৃষ্টি হল তাদেরকে 'খস' জাতি বলে অভিহিত করা হল। খৃষ্টীয় ১৪০০ অব্দে পম্পার মুকুন্দসেন নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। লেফটেনান্ট কর্ণেল ভান্সিট্যান্ট তাঁর 'গোর্খা' নামক পুস্তকে সেন মগদের রাজা ছিলো। 'কিরাত বংশবলীতে 'মগধরাও' কিরাতদের এক শাখা বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু কিরাতদেব 'শ্যানবংশের রাজা ওজিন্দুদের সেন বংশ রাজাদের মধ্যে কি তফাৎ আছে তা আজ সঠিক ভাবে বলা কঠিন। কারণ হিন্দু সেন বংশের রাজারা নিজেদের চিতোরের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়েছিল। আবার হ্যামিলটন (Hamilton তাঁর An accoint of Nepal নামক পুস্তকে সেন বংশ রাজদেব টেমপল (leo Rehard Temple) তাঁব Per --Historic India পুস্তকে হিন্দুস্তানে আসী 'মঙ্গোলী' শ্যান কুযান পার্থী বাজারা বাজনৈতিক ব্যাপারে হিন্দু হয়েছিলেন রাজপুতদের মধ্যে ধরা হয়। সে জন্য কিরাতি শান বংশ ও রাজপুত বলে ধরা হযনা।

মুকুন্দ সেনের চারজন পুত্র ছিল। মানিক সেন, অর্জ্জুন সেন, বিহাঙ্গ সেন ও শোহাঙ্গ সেন। শোহাঙ্গ সেনের রাজ্যে 'মহাত্তবী' নামে প্রদেশ ছিল। সে প্রদেশে জনকপুর নামে একটি গ্রাম ছিল। সে গ্রামে হাজার বছর আগে 'জনক' নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন।

শোহাঙ্গসেনের সৈন্যদলে দু'ভাগ ছিলো 'কিরাতি' ও সকিরাত। সকিরাতের সৈন্য সংখ্যা কমছিল এবং এ দলে সব জাতের সৈন্য ছিল। তারা মাইনে পেত। কিরাতি সৈন্য সংখ্যা বেশী ছিলো। তারা পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত ছিলো এবং প্রত্যেক দল এক এক সর্দারের অধীনে ছিলো। তারা সব সময় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকত। সর্দার নিজেদের ইচ্ছামতো সৈন্য চালনা করতে পারত। তিন চার দলের উপরে একজন মূল সর্দার থাকতো। মূল সর্দাররা জায়গীর পেতো। এই জায়গীরের আয়ে অন্য সৈন্যদের জীবন নির্বাহ হত। কিরাত সৈন্যরা অস্ত্র হিসাবে তিম্মক বা বন্দুক, ঢাল, তোলায়ার, ধনুক তীর ব্যবহার কবতো। বিষ লাগান তীর যুদ্ধে ব্যবহাব কবত না। সে সময় কিরাতি সৈন্য সংখ্যাছিল

৯০,০০০ ‘ হাজার’ । তার মধ্যে পাঁচ হাজার সব সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতো । আদালতে বিচার হতো । বিচারকের অধীনে ‘বিত্তারিয়া ’ ও কোতোয়াল ’ থাকতো। তারা আসামীকে ধরে নিয়ে যেতো। বিচারের যা আয় হত তার ৪/১ অংশ রাজাকে দিতে হতো এবং আয় বিচারালয় পেতো ।

লোহাঙ্গ সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র শ্রীরোমনি হরিহর সেন পম্পা বা মকওয়ান পুরের রাজা হন। তিনি ‘ গোঙ্গওয়ারা’ পর্যন্ত্য নিজের রাজ্যসীমা বিস্তার করেন এবং নিজে ‘ হিন্দুপতি’ উপাধি নেন। তিনি বিহাব প্রদেশ ও জয় করেছিলেন ।

তারপর হরিহর সেনের পুত্র সুরভা সেন মকওয়ান পুরের রাজা হন । তিনি বিহার প্রান্তের প্রবোধ দাস এবং প্রদিয়মুনা বা প্রদোৎম্না উপাধ্যায়কে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। পরে প্রদিয়মুনা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় অনেক রকম গন্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের মধ্যেও একতা নষ্ট হয । তখন উত্তর দিকের কিরাতিয়ারা নিজেরাই দেশ শাসন করতে আরম্ভ করে। হরিহর সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামতি সেন বিজয় পুরের রাজা হন । এবং কনিষ্ঠ পুত্র ‘ মানিক সেন’ মকওয়ান পুরের রাজা হন ।

বিদেশ থেকে যারা ভারতবর্ষে এসে নিজেদের দৈবপুত্র বা দেববংশ বলে পরিচয় দিয়েছিলো তারা ছিলো বাক কুশান । এ কুশানদের মধ্যে রাজা কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন । কিন্তু খৃষ্টাব্দ ৩০০ অব্দে দেববংশী কুষানদের রাজ্য আর ভারতবর্ষে থাকলো না। তারা নূতন জাতের তাড়নায় চতুর্দিকে পালিয়ে যায় । যারা পূর্বদিকে গিয়েছিলো তারা ‘থামমিন্যা’ নামক জায়গায় এক ছোট বাজ্য স্থাপন করেছিলো । এখানকারই একজন রাজা ‘থামমিন্যা’ থেকে তিব্বতের শাক্যপ্রদেশে গিয়েছিলেন । তারপর তিনি ‘ মুরংচাংপো ’ ‘ খারিজেঙ্গে’ আসেন । ‘ কোম্বুম্মা’ ছুম্বীক্ষ’তে এসে তিন বৎসর থাকেন । তার পুত্র সন্তান না থাকায় সর্বদা চিন্তিত থাকতেন । সিকিমে তখন ‘ তান্ত্রিক’ জ্ঞানে সুখ্যাতি পরায়ণ ‘ রিংচোম’ গ্রামের ‘থিকোঙ্গতেক ’ নামে এক রাজা বাস করতো। ক্যেবুম্মা তখন তাঁর কাছে গিয়ে বর চান এবং পবে তাঁর তিনজন পুত্র জন্ম কোবুম্মার বংশ সমস্ত সিকিমের উপব আধিপত্য করার অধিকার প্রাপ্ত এক রাজার জন্ম লাভ হবে । সেজন্য তিনি ক্যেবুমার বংশরাও থিকোঙ্গতেক এর লেপচা এবং ভাটিয়ারা পৃথক জাত হলেও একই বংশের মত থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। কোবুম্মা সিকিমের গান্তোকে বাস করতে থাকেন। গান্তোকের বর্তমান নাম গ্যাংটক কোবুম্মার পাঁচ পুরুষ পরে কুনছোনামগেল সমস্ত সিকিমের রাজা হন। তিনি তখন নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করেন যে রাজা, অর্থ সমগ্রের পিতা । সিকিমের আদিম অধিবাসী লেপচা এবং ভুটিয়ারা আগে থেকে এসে লেপচাদের সাথে সম্বন্ধ করায় লেপচা বংশ মাতার মতো হল। লিম্বু বংশ সিকিমেরই অধিবাসী হওয়ায় তারা ছেলের সমান হল । সেজন্য সিকিমের ভাটিয়া লেপচা ও লিম্ব বংশ পরস্পর পৃথক জাত হলেও , মাতা পিতা পুত্রের মত সম্বন্ধ রেখে দেশ শাসন করতে হবে । নিজেদের মধ্যে কলহ করা উচিত নয় । কেউ কারোর বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয় ।

কুঞ্জা তাম গেল কিরাতি এবং লেপচাদের বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন । সেখানে কিরাতিরা ছোটিম্বা উপাধি পর্যন্ত পেয়েছিলেন । ‘ ছোটিম্বা ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে আইনের গুরু । ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের পরে রাজ্যের একতা নষ্ট হয়ে যায় । ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কিরাতি রাজারা স্বতন্ত্র ভাবে রাজ্য

শাসন করেন। সে সময় কিরাতি সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। সমস্ত কিরাত দেশের ইতিহাস ও কিরাতি ধর্ম শাস্ত্রের অনুসন্ধান হয়েছিলো। দেশের কাকো সেকমা নামক এক কিরাতি পন্ডিত অনেক হিন্দু শাস্ত্র কিরাতি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ গ্রন্থগুলিকে কিরাতি ভাষায় 'পেসপা' বলা হতো। প্রাচীন কাল থেকে কিরাতি ভাষায় 'পেপসা' বলা হতো। প্রাচীন কাল থেকে কিরাতি জাতির উৎপত্তি ও তাদের উত্থান পতনের ইতিহাস গল্প আকারে পিতা তার পুত্রকে মৌখিকভাবে শিক্ষা দিতো। এভাবে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াকে বলা হতো 'খুঙসাপ' এরপর এই খুঙসাপকে পুস্তকাকারে লিখে চারভাগে ভাগ কার হয়। এক এক ভাগের নাম ছিল যথাক্রমে 'সোহাঙবাচা' 'মঞ্জুমবাচা' 'শকশকবাচা' 'সাবজীবাচা' কিরাত ধর্মের মূলমন্ত্র হল — 'ওম চকৎ মুক্কুম হিক্কে ইকসা, তবকলায়ে নাম্মে সাসেওয়াধো।' অর্থ হল — 'ওম, অগ্নি, ইন্দ্র, সরিৎ, বায়ু, বরুণ নমো।'

কিরাতি সাহিত্যের প্রচার করে দেশের বিধানের ব্রতর মধ্যে অনেকজন প্রখ্যাত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে য়াংবক বাসী দ্বিতীয় শ্রীজঙ্গা নামক কিরাতি পন্ডিত কিরাত দেশ ঘুবে ঘুরে সাহিত্য প্রচার কবেন। তার অনেক শিষ্য ছিলো। তাদের মধ্যে "য়ঙজঙ্গার" প্রধান ছিলেন। শ্রীজঙ্গা নিজের দেশে সাহিত্য প্রচারের ভার য়ঙজঙ্গা উপর দিয়ে নিজে সিকিমে আসেন। তিনি এখানে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাহিত্য প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কিরাতিরা তাঁকে পদ্মসম্ভারের অবতার মনে করতেন। তাঁকে দোর্জেলামা নামে সম্মান করতো। এরূপ সাহিত্য প্রচার করে বেড়ানোর সময়ে সিকিমের "তামাঙলামা" তাঁকে বৌদ্ধধর্ম বিরোধি বলে অভিযোগ কবে এবং বিচারে তার প্রাণদন্ড হয়। সাহিত্যপ্রেমী শ্রীজঙ্গা নিজের প্রাণ পর্যন্ত অর্পণ করেন।

বিনা কারণে শ্রীজঙ্গা প্রাণদন্ড হওয়ায় সিকিমবাসী পেমা নামক এক গাঁয়ের মোড়ল নিজের গাঁয়ে বিদ্রোহ করেন কিন্তু তারও শক্তি কম থাকায় তারও মৃত্যুবরণ করতে হয়। এখানে যে শ্রীজঙ্গার প্রাণদন্ড হয় তার উদাহরণ রাজা স্বয়ং তামাঙ্গলামাকেই শ্রীজঙ্গাব বিচারের ভার দিয়েছিলেন। তামাঙ্গলামা শ্রীজঙ্গাকে রাজদ্রোহী বলে প্রমাণ করেছিলেন।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে গোর্খা রাজা শ্রীপৃথ্বী নারায়ন শাহ কিরাতিদের মকওয়ানপুর আক্রমণ করেন। এসময় থেকেই কিরাতিদের পতন আরম্ভ হয়।

শ্রী পৃথ্বী নারায়ন শাহ ধীবে ধীবে একের পর এক রাজ্য আক্রমণ ও জয় করতে থাকেন। তবে তার যুদ্ধে জয় লাভ মোটেই সহজ সাধ্য হয়নি। গোর্খাদের বিরুদ্ধে সমস্ত কিরাতি লেপচা ভুটিয়ারা লড়াই করেছিলো। এবং কোন একটি মাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিরাতিদের অদৃষ্ট নিরুপণ হয়নি। সে যুদ্ধে চীনের রাজ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হোশীতুঙশাঙ কিরাতিদের ২৫ মণ বারুদ ও সাড়ে বারো মণ সিসা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। কিরাতিরা যুদ্ধে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করতে মোটেই পিছু পা হয়নি। অনেক জায়গায় পৃথ্বী নারায়ণ শাহকে পলায়ন করতেও হয়েছিল। ১৭৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগে কিরাতদেশ বিজয় শেষ হয়। মোটের উপর কিরাত দেশ জয় করতে প্রায় ২৪ বৎসর সময় লেগেছিল এবং তা পৃথ্বী নারায়নের জীবনের অবসানের পর রাজা শ্রীরনবাহাদুর শাহকে কিরাত যুদ্ধ সমাপ্ত করতে হয়েছিলো।

লিম্বু কিরাত বংশাবলীতে পাওয়া যায় কুন্দুস জাপাহাঙ্গ নামক রাজার কনিষ্ঠ পুত্র কুচুহাঙ্গ নিজের

সৈন্য নিয়ে তরাই প্রদেশ আক্রমণ করে এবং সেখানে এক দুর্গ তৈরী করে রাজ্য করতে থাকেন। রাজ্যের নাম দেন ' কুচুপিগুবী'। পরবর্তীকালে এ শব্দের অপভ্রংশ হয়ে হলো অজকের ' কুচবিহার'। এই কুচুহাঙ্গের বংশকে 'কোচ' বলা হতো আজ অনেক রাজ বংশী বলেন কোচ এবং মেচে একই বংশ হলেও ভাইদের মধ্যে দেশ ভাগ করে রাজ্য করায় মোরোঙ থেকে কামপ পর্যন্ত কিরাতিদের মেচে এবং কামপরূপ যারা গিয়েছিলো তাদের কো চে বা কাছাড়ি বলা হতো । আজকাল মেচেদের বোরো বলা হয় ।

বোরো বংশাবলীতে এটুকু পাওয়া যায় যে বোরো রাজার তিনজন পুত্র ছিলো । নিজেব জন্মস্থান ত্যাগ করে অন্য দেশ জয় করে রাজ্য স্থাপন করাটা রাজ বংশের কর্তব্য মনে করে পিতাব কাছ থেকে তার অনুমতি প্রার্থনা করে। পিতা তাদের অনুমতি দেন । তারা ভারতবর্ষে আসে এবং সেখান থেকে নেপালের দিকে যায়। এরপর তারও পূর্বে গিয়ে জঙ্গল সাফ করে রাজ্য স্থাপন করে। সেখানে মহাকালবগুড়ি এবং নিজের বংশের নাম হয় বোড়ো বংশ।

ত্রিপুরার রূপকথা প্রসঙ্গে

রূপকথা সাধারণত কতকগুলি অসম্ভব বাহ্য ঘটনার ছদ্মবেশ পড়ে থাকে যা আমাদের মনের গতির সঙ্গে এর প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখতে চেষ্টা করে। সাধারণতঃ রূপকথার রচয়িতার নির্দ্দিষ্ট নাম পাওয়া যায় না। সমস্ত লৌকিক সাহিত্যের মতো এখানেও লেখক একটি সমগ্র জাতি বা গোষ্ঠির পেছনে আত্মগোপন করে থাকেন যেখানে ব্যক্তি বিশেষেকের স্থান নেই। সসস্ত গোষ্ঠিরই প্রাণের কথা, অন্তরতম আশা-আকাঙ্খা এতে ধ্বনিত হয়ে থাকে।

ত্রিপুরায়ও উপজাতি সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে রূপকথা। বাংলায় যাকে রূপকথা বলা হয়ে থাকে, ত্রিপুরী কক্‌বরক ভাষায় তাব কোন সঠিক প্রতিশব্দ নেই। তবে কক্‌বরকে 'কেরাং কথমা' শব্দটি দিয়ে মূলতঃ 'রূপকথা' শব্দটিকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

ত্রিপুবার উপজাতি রূপকথাগুলি শত শত বৎসর যাবৎ বৃদ্ধের মুখ থেকে নাতি নাতনিরা শুনে আসছে। রূপকথার আখ্যানগুলির কোন অংশ গল্পে, কোন অংশে গানে প্রকাশ করে পাহাড়ী অঞ্চলে কথকীরা আজও শ্রোতাদেব মুগ্ধ কবে রাখে। এই রূপকথাগুলিতে তাদের জাতীয় বীবত্ব কাহিনী, প্রেমিক প্রেমিকার উচ্ছ্বাস, ত্রিপুরা বাজাব কথা, ধর্মাচবণ ও প্রাকৃতিক উৎপাতের কাবণ ইত্যাদিব বিষযেব উল্লেখ আছ।

এই উপজাতি রূপকথাগুলি কথকরা গান কববাব সমযে নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় গেযে থাকে। কোথাও কোথাও গানের অংশবিশেষ কথকরা পবিবর্তন বা পবিবর্ধন করে থাকে। কিন্তু তাতে রূপকথার মূল কাঠামোব কোন পবিবর্তন মূলতঃ হয না। এ রূপকথাগুলি উপর আদিবাসীদের বিশ্বাস আজও সমভাবে বিদ্যমান।

প্রথমেই ধরা যাক 'ভুমিকম্প' রূপকথাটি। মাটিব নিচে এক বৃহৎ কচ্ছপ বাস করত। সমস্ত পৃথিবীটা তার উপর ন্যস্ত ছিল। কচ্ছপের চাকব গোববে পোকা বা খেবুং প্রতিদিন পৃথিবীর উপবের জীবজন্তুব বিষ্ঠা কচ্ছপকে এনে দিলে কচ্ছপ তা খেয়ে জীবনধাবণ কবে। এক দিন খেবুং আলস্যবশতঃ কচ্ছপকে বলল পৃথিবীর সব জন্তু মরে গেছে— সুতরাং আর বিষ্ঠা নেই। এতে কচ্ছপ খেবুং-এর কথার সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য গা-নাড়া দিল, তাতে ভূমিকম্প হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মুর্গীর ডিম গেল নষ্ট হয়ে। তাতে সমস্ত জীবজন্তু চেঁচিয়ে বলে উঠল — আমরা বেঁচে আছি। এরপর থেকে তাদের বিশ্বাস ভূমিকম্প হ'লে ডিম নষ্ট হয়ে যায়।

'তালনি বছাজ্‌লা' বা চন্দ্রকুমাব রূপকথাটিতে আদিবাসী উপজাতিদের গৃহকোণের দেবতা 'নকছা মতাই'-এর পূজার প্রচলন এবং ত্রিপুরা নামের ইতিহাসের কথা দেখতে পাই।

রূপকথাটিতে দেখা যায়, পিতৃ-মাতৃহীন কন্যা কুফুব (শুভ্রা) নিঃসন্তান মামা-মামীর কাছে মানুষ। পূর্ণ যৌবনা কুফুর সঙ্গে দেবতা চন্দ্রদেবের মিলনের ফলে কুফু সন্তানসম্ভবা হল। কিন্তু আদিবাসী সমাজ দেবতা মানুষের মিলনের কথা বিশ্বাস করল না। তারা কুফুকে বনে নির্বাসিন দিল। যথাসময়ে কুফু একটি ব্যাঙ-সন্তান প্রসব করল। ব্যাঙ সন্তানটির নাম রাখা হল চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমার বড় হয়ে জানতে পারলো

তার পিতা চন্দ্রদেব। একদিন সে তার পিতার সঙ্গে দেখা করল। পিতা চন্দ্রদেব তাকে বলল, নক্‌ছ দেবতার শাপে তুমি ব্যাঙের রূপ পেয়েছ এবং কষ্ট পাচ্ছ। সময় হলে তোমার কষ্ট দূর হবে।

তখন চন্দ্রকুমার পিতার কাছ থেকে একটি ঘোড়া ও রাজপুত্রের পোষাক চেয়ে নিল। সে পোষাক পড়ে চন্দ্রকুমার অপর এক রাজ্যের রাজকুমারীর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হল। রাজকুমারীর কাছে যাবার আগে চন্দ্রকুমার তার ব্যাঙের খোলসটি ছেড়ে যেত এবং বাড়ি ফেরার সময় পুনরায় ব্যাঙের পোষাকটি পড়ে যেত। একথা চন্দ্রকুমার একদিন রাজকুমারীকে বলল এবং তা জেনেও রাজকুমারী চন্দ্রকুমারকে বিয়ে করল। বিয়ের পর রাজকুমারী একদিন সুযোগ বুঝে চন্দ্রকুমারের ব্যাঙের আবরণটি পুড়িয়ে ফেলতে উদ্যত হলে আবরণের ভেতর থেকে নক্‌ছুমতাই বলল - রাজকন্যা, একটু অপেক্ষা কর, আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে বলে যাচ্ছি যে, আমার পূজা যারা দেবে তাদের কোনদিন অমঙ্গল হবে না। এ বলে 'নক্‌ছুমতাই' চলে গেল। রাজকুমারী তখন চন্দ্রকুমারের আবরণটি পুড়িয়ে ফেলল। এরপর রাজকুমারের আসল রাজপুত্রের রূপটি প্রকাশ পেল। তখন রাজকন্যার পিতা জামাতা চন্দ্রকুমারকে রাজ্য দিয়ে বনে চলে গেলেন। চন্দ্রকুমারের তিন পুত্র হ'ল। তিন পুত্র বহু দেশ জয় করল। তখন সবাই বলত ত্রিপুত্রা রাজার রাজ্য। সেই ত্রিপুত্রা হতেই 'ত্রিপুরা' নামের সৃষ্টি।

উপরোক্ত 'চন্দ্রকুমার' রূপকথাটিতে রয়েছে মানবীর উপাদান। কুমারী কন্যার গর্ভ নিয়ে সমাজ বিক্ষোভ, নির্যাতন, মানবীর অসহায় জীবন- যাপন। ব্যাঙ সন্তানের জন্যে মায়েব অপত্য স্নেহ। অর্থাৎ সন্তান যে - রকমই হোকনা কেন মায়ের কাছে সবসময়ের আদরের। চন্দ্রকুমার ও রাজকুমারীর প্রেমে দুঃখ সহন। তাঁদের খাঁটিপ্রেম সমাজ কর্তৃক অস্বীকৃত এবং গৃহদেবতার প্রচারের জন্যে, কিছুটা ব্রতকথার উপর বিশ্বস স্থাপন প্রভৃতি ঘটনার পরিবেশ রূপকথার ধর্ম অনুযায়ী কিছুটা অবান্তর ঘটনাও রয়েছে। যেমন ব্যাঙ সন্তান প্রসব। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যেতে পারে টোটেম সমাজের কিছুটা প্রভাব পড়েছে রূপকথাটিতে। চন্দ্র দূতের সাহায্যে রাতারাতি তৈরী পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চড়া। ব্যাঙের খোলস পুড়িয়ে ফেলা ইত্যাদি। তবে এই রূপকথাটিতে আমরা দেখতে পাই যে নিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত সফলতার দ্বারে পৌঁছে দেয়।

'মমরাছা' বা 'বানরের গল্প' রূপকথাটিতে আদিম যুগের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন যুগে প্রথম যখন মানুষ আগুন, কৃষি, আবিষ্কার করল, সমাজ গঠন করল, প্রসার ঘটাল শিল্পেব, সৃষ্টি হল ধর্ম ও ভাষার — তারই কথা পাই এই রূপকথাটিতে। রূপকথাটিতে আছেঃ

কোন এক সময়ে জুমে কর্মক্লান্ত সাত বোন কোন এক ছড়ায় স্নান করার আগে পোষাক 'রিয়া' ছড়ার পাড়ে রেখে স্নানে নামল। সেই সুযোগে একটি বানর তাদের পোষাকগুলো নিয়ে গাছে উঠে বসল। স্নান শেষ করে যখন সাতবোন তাদের কাপড়গুলি বানরের হাতে দেখল এবং বানবকে তাদের কাপড়গুলি ফিরিয়ে দিতে বলল বানর বেগুনের বিনিময়ে কাপড়গুলি ফিরিয়ে দিতে রাজী হল। অগত্যা একে একে ছয় বোন বেগুনের বিনিময়ে কাপড়গুলি ফেরৎ পেল। কিন্তু ছোট বোন যখন বেগুন দিতে গেল তখন বানর ছোট বোনকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গেল এবং ছোটবোনকে নিয়ে সংসার পাতল। কিছুদিন পর বানরের ঔরসে ছোটবোনের গর্ভে একটি সন্তানের জন্ম হল। সন্তানটির নাম বাখা হল 'ততে'।

যদিও ছোট বোনটি নিয়তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল কিন্তু মনে রইলো কুটিলতা। একদিন তেঁতুল খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বানরকে তেঁতুল আনতে দূরদেশে পাঠিয়ে দিল এবং সেই সুযোগে ততের মা ততেকে নিয়ে পালিয়ে বাপের বাড়িতে চলে এল। বানরটি ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে স্ত্রীর সন্ধানে বের

হল এবং বহু খোঁজাখুঁজির পর শ্বশুর বাড়িতে এসে হাজির হল। শ্বশুর বানর জামাইকে দেখে আদর যত্ন করে থাকতে দিল। কিন্তু বানরের মানবী স্ত্রী ততের মা কিন্তু বানর স্বামীকে নিজেরই স্বামী বলে ভাবতে লজ্জা ও ঘৃনা বোধ করল। তাই বানর স্বামীকে বধ করার জন্য পারিকল্পনা অনুযায়ী একটি টংঘর তৈরী করা হল যার মাঝটা ফাঁকা। রাতে সেখানে বানর স্বামীকে নিয়ে ততে সহ মানবী স্ত্রী নিদ্রা গেল এবং সুযোগ বুঝে ঘুমন্ত বানর স্বামীকে ফাঁকা মেঝেতে ঠেলে দিল। তাতে বানরটি টংয়ের নিচে পড়ে গেল। টংয়ের নিচে থাকা শূকরগুলি বানরের দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

উপরোক্ত 'মমরাছা' রূপকথাটিতে মানব সভ্যতার প্রথম যুগে যখন মানুষ নিজেকে অন্যতম প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত, মানব বানরের বংশধর অথবা মানুষ বানরের সমগোত্রীয় কিংবা মানুষে বানরে সম্বন্ধ হতে পারে — এ ধরণের চিন্তাধারাকে উপজাতীয়রা মেনে নিতে পারল না। তাই রূপকথাটিতে মানবীব লজ্জা ঘৃণা অপমানেব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বানরটিকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তার পুত্র ততেকে হত্যা করা হয়নি। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই বলতে পারা যায় ততেও একদিন বড় হয়েছে, বিয়ে করে সংসার পেতেছে। অর্থাৎ ডারউইনের বির্বতনবাদকে শেষ পর্যন্ত উপজাতিরা মানতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য এমনও হতে পারে, অতিরিক্ত বাৎসল্য হেতু বানর পুত্র ততেকে মা বধ করেনি।

'চেথুয়াং বৃক্ষের রূপকথাটি আমরা সভ্যতার ইতিহাসের একটা ছাপ দেখতে পাই। নৃতত্ত্ববিদগণের মতে, আদিম মানব সমাজ ছিলো মাতৃকেন্দ্রিক। ভাই বোনের মিলনের রেওয়াজ ছিলো। পিতৃকেন্দ্রিক ধারা স্বীকৃত হয়েছিল বহু দীর্ঘকালের ব্যবধানে। সহোদর ভাই বোনের বিবাহ পদ্ধতিও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়। ত্রিপুরার উপজাতিরা বিভিন্ন কোমের অধিবাসী যারা প্রথম যুগে মাতৃকেন্দ্রিক ছিল এবং পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে আর্য সমাজের প্রভাবে পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অগ্রসর হয়েছিল।

চেথুয়াং বৃক্ষের রূপকথাটি হল — গামং আর কুফুরতি। তারা দু'জনে সহোদর ভাই বোন। একত্রে তারা জুমের কাজ করে। একদিন কোন একটি ছড়া পার হওয়ার সময় কুফুরতি উরুর ওপর কাপড় তোলায় তার উরুর মসৃণতা দেখতে পেয়ে সহোদর ভাই গামং-এর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হল। সে তখন কুফুরতিকে বিয়ে করার মনস্থ করল। আত্মীয় স্বজন এমনকি কুফুরতিও গামংকে অনেক বোঝাল এবং এই ইচ্ছা ত্যাগ করতে বলল। কিন্তু গামাং কিছুতেই সহোদর বোনকে ব্যতীত অন্যকে বিয়ে করতে রাজী হল না। তখন কুফুরতি ছাতিম গাছের (চেথুয়াং) কাছে গিয়ে তাকে রক্ষা করতে বলল এবং ছাতিম গাছের ওপরে উঠল, কুফুরতিকে গাছে উঠতে দেখে তাকে ধরবার জন্য গামংও গাছে উঠল, দেখে তাকে ধরবার জন্য গামং গাছে উঠল, কিন্তু গামাং যতই গাছের উপর উঠতে লাগল' গাছও ততই বড় হতে লাগল। এক সময় কুফুরতি গাছ হতে স্বর্গে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে গামাং সহ গাছটি ভেঙে পড়ল। নৃতত্ত্ববিদগণের মতে 'প্লাইয়োসিন' যুগে পিমোকানথ্রোপাস' ও 'ইয়োন থ্রোপাস' মানবের ও মানবজাতির সাধারণ শাখাপ্রসূত 'নিয়াণ্ডারথাল' মানবের আবির্ভাবি ঘটেছিল। সেসময় তারা যৌথভাবে চলাফেরা করত উলঙ্গ থাকত। সে আদিম অবস্থায় তাদেব সমাজব্যবস্থায় সকল পুরুষ সকল নারী পরস্পরের উপভোগ্য ছিল। সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় সেসময় বিবাহ পদ্ধতি হয়নি, সুতরাং সে যুগে সহোদর ভাইবোনের বিবাহ বা মিলন দোষের ছিল না। 'চেথুয়াং' রূপকথাটিতে সে যুগের চিত্রই পরিস্ফুট হয়েছে।

'হাতির কথা' রূপকথাটি নীতিমূলক। কিন্তু বিষয়বস্তু অবান্তর। বিধবা মায়ের এক ছেলে ও এক

মেয়ে। মা উভয়কে দক্ষিণ দিকে যেতে বারণ করেছেন, কিন্তু তারা দুজনে দক্ষিণ দিকেই গেল। সেদিকের একটা দীঘিতে স্নান করবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হাতিতে রূপান্তরিত হল। তখন তাদের মা তাদেরকে বনে যেতে বলল। যাবার আগে তাদেরকে উপদেশ হিসাবে বলল —— পরের গোলা ভেঙো না, আগুন দেখলে বল্লম দেখলে ভয় পাবে।

'খুমপুই বাররুরুক' ত্রিপুরার একটি জনপ্রিয় রূপকথা। এই রূপকথাটি টোটেমিজম-ধর্মী। যেসব আদিম জাতি প্রাচীন যুগে কোন জীবজন্তু বা বৃক্ষকে ভগবানের প্রতীক হিসেবে বিশ্বাস করত তাদেবকে টোটেম বলত।

রূপকথাটির প্রথমেই দেখতে পাই, এক অচাইয়ের দুই কন্যা। পিতাব উদাসীনতাব জন্য তাদের জুমে কোন টংঘব ছিল না। যার দরুণ তারা খুব কষ্টে জুম চাষ করত। একদিন বড় মেয়ে বনদেবতাকে স্মরণ করে প্রতিজ্ঞা করল, যদি কেউ আমাদের টংঘর তৈরী করে দেয তবে তাকে আমি বিয়ে কবব। একথা বনদেবতা শুনে পরের দিন তাদের জন্য সুন্দব একটি টংঘর তৈরী করে নিজে অজগব সাপেব বেশ ধরে টং ঘরে শুযে থাকল। পরদিন দু'বোন জুম ক্ষেতে টংঘর দেখে খুসী হল। টংঘরের ভেতবে দুবোন ঢুকেই দেখল অজগর সাপ। অজগব সাপটিকে বনদেবতা ভেবে বড় বোন তাকে স্বামীরূপে বরণ ক'বে নিল।

এবপর রূপকথাটির গতি অন্যদিকে মোড় নিল। পিতা অচাইযেব সাপকে কন্যাব স্বামীরূপে ভাবতে সংস্কারে বাধল। তাই তিনি সুযোগ বুঝে একদিন সাপটিকে মেরে তার মাংস বান্না করে বড় বোনকে খেতে দিল কিন্তু বড় কন্যা যাকে স্বামীরূপে দেবতা জ্ঞান করেছে তাব মাংস কোন অবস্থাতেই খেল না।

বড় কন্যাব চিন্তাধারার সঙ্গে কিছুটা টোটামীয চিন্তাধাবাব সংমিশ্রণ ঘটেছে। অপরদিকে স্বামীর মাংস স্ত্রীকে খেতে দেবার রেওয়াজ সেই আদিম যুগেব সমাজ ব্যবস্থাবও আগেব ঘটনা। সুতবাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এই রূপকথাটি আদিম যুগের অনেক আগেব সমযকার রূপকথা।

'খুমপুই বাররুরুক শব্দটার বাংলা অর্থ কোথাও ভূঁইচাঁপা কোথাও দোলনচাঁপা, আবাব কোথাও লিলি ফুল। কোনটা ঠিক, তা ভাষাবিদগণের বিচার্য বিষয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যযোগ্য এই 'খুমপুই বাবরুরুক' রূপকথাটির অনুরূপ রিয়াং রূপকথা 'কাকাদংগুই'। তবে রিয়াং রূপকথাটি বড় বোন ওয়াই জাংরিমার প্রণয়প্রার্থী কাকদংগুইথুই এবং তিনি সাপের বেশ ধবে ভায়ের কন্যাকে বিয়ে করেন। ত্রিপুরী রূপকথা 'খুমপুই' বাররুককে' বড় বোনের জলের মধ্যে আত্মবিসর্জনের কথা আছে, কিন্তু রিয়াং রূপকথাটিতে বড় বোনেব রক্তেব নদীব মধ্যে আত্মবিসর্জনের কাহিনী। এবং রিয়াং রূপকথাটি ছোট বোনের মৃত্যুও হয়েছে।

কাকা এবং ভাইঝির বিয়ের ব্যাপারটা অনেকটা 'চেথুয়াং' রূপকথার ভাই বোনের বিয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। উভয় রূপকথাতে ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কেব সঙ্গে বিযের রেওয়াজের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

আবার ওই রিয়াং রূপকথাটির শেষের দিকে দু'টি নদীর নাম যুক্ত হয়েছে। বড়বোন ওয়াই জাংরিমা যেখানে মরেছিল পরবর্তী কালে সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল একটি নদী যার বর্তমান নাম শরমা। এবং ছোট বোন গ্রিংজাংরিমা যেখানে মরেছিল সেখানেও উৎপত্তি হয়েছিল একটি নদী যাব বর্তমান নাম রাইমা।

'সিপিংতুই মাইকুতুই' রূপকথাটিতে কন্যার প্রতি বিমাতাব ঈর্ষা - পবশ্রীকাতবতার ছবি ফুটে উঠেছে।

সিপিংতুই রাজরাণী হয়েও বিমাতার চক্রান্তে বনে নির্বাসিতা হল এবং সেখানে বিমাতার কন্যা মাইরুংতুইকে রাণী করা হল। কিন্তু রাজা সমস্ত চক্রান্ত জানতে পেরে মাইরুংতুইকে বধ করে তারই রক্তে সিপিংতুইকে স্নান করালেন এবং মাইরুংতুইয়ের মাংস রেঁধে তার মা ভাইকে খেতে দিলেন।

নরমাংস আহার অনার্য যুগের কথা সেদিক থেকে রূপকথাটির সময়কার সে যুগের বলে মনে হয়। এই রূপকথাটিতে ত্রিপুরার সে যুগের উপজাতি হস্তশিল্পের দক্ষতার কথা আছে। তদের রিয়া(বক্ষবন্ধনা), রিগনাই (পরিধেয় বস্ত্র) তৈরী তার প্রমাণ।

'নওয়াপাখী' বড়বোন ছোট বোনকে হিংসা করত। একদিন সুযোগ বুঝে ছোটবোনকে জলে ফেল দেয়। জলে ছিলো বোয়াল মাছ, সে ছোটবোনকে খেয়ে ফেলল। তাদের দিদিমা সে কথা জানতে পেরে বোয়াল মাছের পেট থেকে ছোট বোনকে রক্ষা করলেন। বড় বোনের ছোট বোনের প্রতি এই ব্যবহারের কথা জানতে পেরে বড় বোনকে শাস্তিস্বরূপ খাঁচায় বন্দী করে অভুক্ত রাখা হল। বড় বোন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নওয়া পাখীর কাছ থেকে পাখা চেয়ে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রূপকথাটি সুখপাঠ্য। রূপকথাটিতে খারাপ কাজের ফলভোগ যন্ত্রণাদায়ক, এই নীতি বাক্যটির প্রকাশ পেয়েছে।

যুদ্ধকালীন বিপদসংকেত বা দেশরক্ষার আহ্বান'ফুরাই' রূপকথাটিতে দেখতে পাই। সর্দারেব মেয়ে ছিয়ারীর (শিশিরকন্যা) সঙ্গে দিয়ারির (গণৎকার) বিযের সময় হঠাৎ বেজে উঠল 'ফুরাই'। বিযেব আসর থেকেই বর দিয়ারি যুদ্ধে চলে গেল। যুদ্ধ শেযে দিয়ারি দেশে ফেরার সময় পথে এক রাক্ষসীর কবলে পড়ে সবকিছু ভুলে যায় এবং এক সুন্দরী পরীকে বিয়ে করে। এদিকে ছিয়ারীকে রাজা বিয়ে করত চায়। রাজার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ছিয়ারী পর্বতের ওপর থেকে ঝাঁপ দিল, কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই এক পাখি তাকে ডানায় উঠিয়ে নিয়ে দিয়ারীর কাছে যায়। দিয়ারী সব শুনে রাজাকে পরাজিত করে দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

'ফুরাই' রূপকথাটিতে উপজাতি সমাজের কিছু রীতির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে। উপজাতিদের বিয়ের নিয়ম বাঁশের বেদী, চাঁদোয়া এবং তাদের শিল্পকলার পরিচয়, তদুপরি ধর্মীয় দিক থেকে লাম্প্রা পূজা এবং পূজাতে ডিম মোরগ প্রভৃতির প্রয়োজন ইত্যাদির কথা ও সামাজিক প্রথার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। তবে রূপকথাটি অলৌকিক উপাদানে ভরপুর।

'কাঞ্চনমালা' রূপকথাটি ময়মনসিংহ গীতিকার 'দেওয়ান ভাবনা' পালার অনুরূপ কাহিনী।

'কমলাবতীনি কক' ও 'মিলক লেপচা' রূপকথা দু'টি মূলতঃ ব্রত কথা। 'মতাইমান' (রাতের দেবী) কমলাবতী রূপকথার দেবী। আর 'ছাকলক মতাই' মিলক লেপচার রূপকথার দেবী। এই দু'টি রূপকথা যদিও ত্রিপুরী ভাবগত বৈশিষ্ট্য হিন্দুধর্মের দ্যোতক হিসেবেই ধরে নেয়া যায়। হিন্দুদের লক্ষ্মীপূজা বা বিপদনাশিনী পূজা রূপকথাতেই বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পরিশেযে বলা যায়, ত্রিপুরার নিজস্ব বহু রূপকথা রয়েছে যা আমার এই আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরে আনতে পারিনি -- আশা রাখি পরবর্তী গবেযকগণ ত্রিপুরার রূপকথা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে ত্রিপুরার সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করবেন।